গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১১ - ১৭ নভেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

''সাম্রাজ্যবাদ হ'ল পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিংশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদ সেই স্তরে উপনীত হয়েছে। পূর্বতন জাতীয় রাষ্ট্র — যা গড়ে না উঠলে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না — সেগুলি আজ আর পুঁজিবাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুঁজিবাদ কেন্দ্রীকরণকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, শিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিকে ধনকুবেরদের সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট ও অ্যাসোসিয়েশন অধিকার করেছে এবং 'পুঁজির সম্রাটরা' হয় উপনিবেশ করে অথবা অন্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক শোষণের হাজার রকমের জালে আটকে প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ... সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে পুঁজিবাদ ছিল জাতির মুক্তিদাতা সেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এখন জাতির সবচেয়ে বড় উৎপীড়কে পরিণত হয়েছে। আগে যে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল, আজ সে প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদ আজ উৎপাদিকা শক্তিকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যে, উপনিবেশ সৃষ্টি, একচেটিয়া ব্যবস্থা, নানা সুযোগ সুবিধা এবং জাতির উপর সমস্ত রকমের উৎপীড়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে মানবসমাজকে হয় বছরের পর বছর এমনকি কয়েক দশক ধরে 'বৃহৎ শক্তিগুলির' সশস্ত্র সংঘর্ষের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, নতুবা তারই বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।''

ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়ার প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

কংগ্রেস পরিচালিত ও সিপিএম-সিপিআই সমর্থিত, কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার, গত এক বছরের মধ্যেই বিশ্বের জনগণের পয়লা নম্বর দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে যেভাবে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক আঁতাত গড়ে তুলছে ও ভারতের মাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিচ্ছে, চরম প্রতিক্রিয়াশীল বিজেপি পরিচালিত পূর্বতন এনডিএ সরকারও এতটা পারেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সরকারের এই ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতারই নির্দশন হিসাবে ৭ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুন্ডায় ভারত-মার্কিন সামরিক বিমান মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

আমরা মনে করি, যদি দেশে আগের মত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের জোয়ার থাকত এবং সিপিএম বাইরে বিরোধিতার ভড়ং দেখিয়ে কার্যত প্রচ্ছন্নভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত সরকারের গাঁটছড়া বাঁধার নীতিকে সমর্থন না করত তাহলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই দেশের মাটিতে, ইরাক ও আফগানিস্থানের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী যুদ্ধবাজ মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাথে যৌথ মহড়া করতে সাহস করত না।

সম্প্রতি এক মার্কিন বাহিনী ইরাকে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে উত্তর-পূর্ব ভারতে যৌথ মহড়া করে গেছে। এইভাবে পরদেশ আক্রমণের সামরিক ট্রেনিংক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করা হচ্ছে। 'বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার' মার্কিন স্কীমে ভারতকে সাকরেদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের সাথে শুধু সামরিকই নয়, অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক চুক্তিও হয়েছে। ভারতের

চারের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভে বিশ্ব উত্তাল
ভারত কেন পিছিয়ে

মাত্র এক বছর হয়েছে জর্জ বুশ দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসেছেন। ৩ নভেম্বর ছিল তাঁর অভিষেকের বর্ষপূর্তি। এই দিনটিকেই আমেরিকার জনগণ বেছে নিয়েছিল বুশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা উগরে দিতে। শহরে শহরে হাজার হাজার, কোথাও লাখেরও বেশি জনগণ রাস্তায় নেমেছিল শুধু একটি কথা জানাতে — বুশ সরকার নিপাত যাক। ইরাকে আগ্রাসন, জনবিরোধী আর্থিক নীতি, সামুদ্রিক ঝড় ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি চরম অবহেলার প্রতিবাদে জনগণ বলেছে — 'এই সরকার আমরা চাই না', ''দুনিয়ার মানুষ আর অপেক্ষা করতে পারেনা, এখনই তাড়াও এই প্রেসিডেন্টকে।'' মার্কিন জনগণের প্রায় সকল অংশই মিছিলে যোগ দিয়েছিল। শান্ত থাকেনি বিক্ষোভ, আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে পুলিশের দিকে। পশ্চিম গোলার্ধের সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক হচ্ছে আর্জেন্টিনায়। ৪ নভেম্বর জর্জ বুশ গেছেন। সাম্রাজ্যবাদশিরোমণি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ''অভ্যর্থনা'' জানাতে আর্জেন্টিনার মানুষ আগেই নেমেছে রাস্তায়। বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনা নিজেকে আর কেবল খেলার জগতে আবদ্ধ রাখতে পারেননি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে সক্রিয় প্রতিরোধে সামিল হওয়ার প্রয়োজন ঘোষণা করে তিনি যোগ দিয়েছেন গণবিক্ষোভে। আমেরিকার পর এখন আর্জেন্টিনা কাঁপছে। ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় প্রতিটি দেশেই এখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের তুফান চলছে। একদিনের একটা মিছিল, সভা বা কনভেনশন নয়, আন্দোলন চলছে লাগাতার।

অথচ আমাদের দেশ ভারতে আন্দোলনের সামান্য আলোড়নও নেই। কিন্তু কেন? কেন্দ্রে যখন বিজেপি'র সরকার, তখন মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তান-ইরাকে নগ্ন আগ্রাসন চালিয়ে দুই দেশের স্বাধীনতা ধ্বংস করল, ইউরোপ-আমেরিকার জনগণ লাখে লাখে রাস্তায় নেমে তুমুল প্রতিবাদে সামিল হল, ভারতে কিছুই হল না। এখন সিপিএমের সমর্থনে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। আণবিক শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে ভারত সরকার; ভারত-মার্কিন সামরিক সমঝোতার পরিণামে খোদ-পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুণ্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়াও হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তার ভিত্তিতে স্থির হয়ে গেল, বিমান মহড়াও অবাধে চলবে, বাইরে সিপিএমের বিক্ষোভের মহড়াও থাকবে। বামপন্থার নামে এই জঘন্য আপসকামী রাজনীতিই কি ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে না ওঠার জন্য দায়ী নয়?

দেশের সকল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ ও শক্তিগুলিকে ভেবে দেখতে হবে — এটাই কি চলবে? ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহ্য কি এভাবেই অপমানিত হবে?

৪ নভেম্বর, ২০০৫ আর্জেন্টিনায় বুশবিরোধী প্রবল বিক্ষোভ

১৪ নভেম্বর এ আই কে কে এম এস-এর ডাকে কৃষক সমাবেশ ও আইনঅমান্য সফল করুন

বানভাসি মানুষদের সাথে কুলতলি বিডিও'র অমানবিক আচরণ

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্য, ত্রাণ বিলি নিয়ে পঞ্চায়েত ও সিপিএম-এর ঘৃণ্য দলবাজি, বিপিএল তালিকায় কারচুপি এবং সরকারি স্কিমের টাকা তছরূপ বন্ধ করা, সকলের জন্য রেশন কার্ড দেওয়া সহ ১১ দফা দাবিতে ২৮ অক্টোবর শত শত বানভাসি মানুষ কুলতলি বিডিও অফিসে বেলা ১১টা থেকে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

আলোচনায় বসার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বিডিও অফিসে না আসায় বানভাসি জনতা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিডিও অফিস অবরোধ করে। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলতে থাকে। আন্দোলনের চাপে বিডিও বেলা ৪টায় অফিসে আসতে বাধ্য হন।

কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল ও কমরেড সহদেব মণ্ডলের নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও'র সাথে আলোচনায় বসেন। আলোচনার শুরুতেই বিডিও দাবিগুলি সম্পর্কে কোন সদুত্তর দিতে অস্বীকার করেন, প্রতিনিধিদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। বানভাসি মানুষদের ব্যক্তিগত আবেদনপত্রগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও প্রবল বিক্ষোভের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন। যেসব গরিব মানুষের প্রকৃতই ঘর নষ্ট হয়ে গেছে তাদের বদলে পাকাবাড়িওয়ালা সিপিএম সমর্থকরা ত্রিপল পাচ্ছে কি করে এরও কোন সদুত্তর বিডিও দেননি। বিডিও'র অসহযোগিতামূলক এবং বৈরী আচরণ দেখিয়ে দেয় প্রশাসন জনগণের সমস্যার প্রতি কত উদাসীন।

বন্যাত্রাণ ও সরকারি স্কীমের টাকা তছরূপ ও দলবাজীর বিরুদ্ধে কুলতলির সর্বত্র গ্রামে গ্রামে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত শত শত মানুষের কাছে আহ্বান রাখেন নেতৃবৃন্দ। এদিনের অবস্থানে কলকাতায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ ও গুলি চালনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড অমল সাউ। কমরেড শিশির মিস্ত্রী বিদ্যুতের দাম কমানোর ও চাষীদের বিনামূল্যে বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সারাদিনের এই বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল, সহদেব মণ্ডল, সাইফুদ্দিন শেখ, প্রবোধ হালদার, প্রদীপ হালদার, শোভারঞ্জন তাঁতী, বিশ্বনাথ নস্কর, দেবকুমার মণ্ডল প্রমুখ।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বন্যার্তদের ডেপুটেশন

গত ১৯ অক্টোবর প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই এস ইউ সি আই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে দু'শ বন্যাপীড়িত মানুষ বালুরঘাটে জেলাশাসকের কাছে সাত দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। বন্যায় মৃত ব্যক্তিদের প্রতিটি পরিবারকে পাঁচলক্ষ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেবার দাবিটি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

এবারের বন্যায় জেলার অধিকাংশ কৃষক ও মৎস্যজীবী সর্বস্বান্ত হয়েছেন, ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি। এবার শুরু থেকেই সরকারি রিলিফের দাবিতে বন্যার্তরা মিছিল ও বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কুমারগঞ্জে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে ত্রাণ বিতরণের কাজ চালানো হয়। এছাড়া দলের জেলা কমিটির উদ্যোগে বন্যার্তদের মধ্যে ৮ কুইন্ট্যাল চাল বিতরণ করা হয়।

নিখোঁজ শিশু উদ্ধারের দাবিতে রায়গঞ্জে ব্যাপক আন্দোলন

সাড়ে চার বছরের ফুটফুটে শিশু বুদ্ধদেব বর্মনের খোঁজ কি দেবে না পুলিশ প্রশাসন? চার মাস আগে নিখোঁজ হওয়া এই শিশুটি জীবিত কি মৃত তার কোন হদিস কেন দিতে পারছে না রায়গঞ্জ পুলিশ? তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের এই শিশুটিকে খুঁজে বের করার দাবি কেন বারবার 'করছি, করব' বলে উপেক্ষিত হবে? কেন রায়গঞ্জ পুলিশ শিশুটির বাড়ির কাছের পাটখেতে, একটি মাথার খুলি ও চারটি হাড়ের টুকরো দেখিয়ে কোনও ফরেনসিক তদন্ত ছাড়াই বলবে শিশুটি খুন হয়েছে? এ কি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার বাহানা নয়? আর যদি খুন হয়েই থাকে তাহলে কারা খুন করল তাদের পুলিশ খুঁজে বের করছে না কেন? তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? গত ২৯ জুন রায়গঞ্জের ২নং জগদীশপুর গ্রামের শিশু বুদ্ধদেবের নিখোঁজ হওয়া ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গোটা রায়গঞ্জেই এই প্রশ্ন উঠেছে।

আন্দোলন শুরু থেকেই চলছে। শিশু উদ্ধারে পুলিশ তৎপর না হওয়ায় ১১ জুলাই পাঁচ শতাধিক মানুষ ডি এম'র কাছে ডেপুটেশন দিয়ে উদ্ধারের দাবি জানান। ডি এম অতি দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধারের আশ্বাস দিলেও অতি দ্রুতই তা ভুলে যান। এই অবস্থায় গ্রামের মানুষ আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু সংগঠন কোথায়? কে নেতৃত্ব দেবে? গ্রামবাসীদের সমস্যা গ্রামবাসীদেরই মেটাতে হবে। নিজেদেরই এগিয়ে এসে নেতৃত্বের হাল ধরতে হবে। অনুষ্ঠিত হল গণকনভেনশন। দুই সহস্রাধিক মানুষ সামিল হলেন। কনভেনশন থেকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে ওঠে 'সংগ্রামী গণমঞ্চ'। এই মঞ্চের নেতৃত্বে ২৬ জুলাই দুই সহস্রাধিক মানুষের মিছিল রায়গঞ্জ শহর পরিক্রমা করে এবং জেলা আদালতের সামনে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় পথ অবরোধ করে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ৭ দিনের মধ্যে শিশুটির হদিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

এবার পুলিশ প্রশাসন অন্য পথ নেয়। পাটখেতে মাথার খুলি ও হাড় পাওয়ার গল্প ফেঁদে শিশুটিকে উদ্ধারের দায়িত্ব এড়াতে চায়। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রশ্ন ঐ জমিতে মরে পচে গেলে পাশের খেতে কাজ করার সময় বা যাতায়াতের সময় দুর্গন্ধ পাওয়া যায়নি কেন? এই অবস্থায় সংগ্রামী মঞ্চ ফরেন্সিক টেস্ট এবং ডিএনএ টেস্টের দাবি জানায়। কিন্তু এসপি, ডিএম এক্ষেত্রে টালবাহানা করতে থাকায় ২৬ সেপ্টেম্বর সংগ্রামী গণমঞ্চ আমরণ অনশনে বসে। শিশুটির বাবা-মা সহ ৫০ জন গ্রামবাসী অনশনে সামিল হন। শহরের প্রচুর মানুষ অনশনকারীদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। ডি এন এ টেস্টের দাবি মেনে নিলে ২৭ সেপ্টেম্বর অনশন তুলে নেওয়া হয়। অনশনের পর মাসাধিক কাল পার হয়ে গেলেও আজও ডি এন এ টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক টালবাহানা ও গাফিলতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী গণমঞ্চ আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মঞ্চের সম্পাদক বিমল সাহা।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার কমরেড দীনবন্ধু বর্মন গত ২৭ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। কমরেড দীনবন্ধু বর্মন ১৯৭৫ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এস ইউ সি আই দলের কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস-এর সাথে যুক্ত হন। এলাকায় তিনি কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করা সত্ত্বেও দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য এলাকার সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিন কঠিন রোগে এবং অনাহারে অর্ধাহারে থাকলেও তিনি নিজেকে আদর্শচ্যুত হতে দেননি, কোনও প্রলোভনের কাছে মাথা নত করেননি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে এলাকার সমস্ত কমরেডরা সমবেত হন এবং লাল সেলাম জানিয়ে কমরেড দীনবন্ধু বর্মনকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান।

এগরা কলেজে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের হামলা

কলেজগুলিতে শুধু এস এফ আই-ই নয়, তৃণমূল ছাত্রপরিষদ কেমন সন্ত্রাস চালাচ্ছে মেদিনীপুরের এগরা কলেজ তারই অন্যতম প্রমাণ। প্রতিবাদী ডি এস ও কর্মীদের উপর একবার নয়, বারবার টিএমসিপি'র আক্রমণের মূল কারণ কী? কারণ এই কলেজে ভর্তির সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্তৃপক্ষের মদতে ছাত্রদের থেকে নানা ছলে প্রচুর টাকা আদায় করে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ মাত্রাছাড়া ফি বাড়ানো সত্ত্বেও, তার প্রতিবাদ করা দূরের কথা, ডি এস ও'র প্রতিবাদী আন্দোলন ভাঙতেই তারা তৎপর হয় বেশি।

এবছর এই কলেজে ভূগোল পাশকোর্স নিয়ে ভর্তি হয় ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৭০০ টাকা করে ভর্তি ফি এবং ১২০০ টাকা ইন্সট্রুমেন্টাল ফি হিসাবে আদায় করা হয়। প্রথম থেকেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এবং ডি এস ও এর প্রতিবাদ করে এসেছে। এত টাকা ফি নেওয়া সত্ত্বেও কলেজে পর্যাপ্ত পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক না থাকায় ঠিকমত ক্লাস হচ্ছিল না। এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ ছিলই। এই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ হঠাৎই সিলেকশান টেস্টের নামে এক পরীক্ষা নেয় এবং তাতে মাত্র ৬৫ জন ছাত্রকে পাশ করায়। এর প্রতিবাদে ৫ অক্টোবর ডি এস ও প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। তাদের এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি-ঘুষিতে ১০ জন ডি এস ও কর্মী আহত হয়। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রঞ্জিত মণ্ডলের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে প্রথমে এগরা হাসপাতালে পরে মেদিনীপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারি নির্দেশে তার সিটি স্ক্যান করানো হয়। এই আক্রমণের প্রতিবাদে ৬ অক্টোবর ডি এস ও'র ডাকে কলেজে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। উক্ত ১৩০ জন ছাত্রছাত্রীকেই ভূগোল পড়ার সুযোগদান, আহত রঞ্জিত মণ্ডলের চিকিৎসার খরচ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডি এস ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

নলহাটিতে কৃষক ডেপুটেশন

বীরভূম জেলার নলহাটিতে ২৮ সেপ্টেম্বর কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন, রিক্সা ও ভ্যান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন, মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও নলহাটি পুরসভা সুইপার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে কয়েক দফা দাবিতে নলহাটি ১নং বিডিও-র কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষে নলহাটি রাম মন্দির ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে নলহাটি ১নং ব্লকে খাস জমি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও রেশন কার্ড নিয়ে দুর্নীতি রোধ, স্থানীয় ক্যানাল সংস্কার করে সেচের ব্যবস্থা, কৃষিতে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, সস্তা দরে সার-বীজ-ডিজেল সরবরাহ করা, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরি দেওয়া এবং কৃষক উচ্ছেদ করে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের জমি উপঢৌকন দেওয়ার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই নলহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম। বিশাল সুসজ্জিত মিছিল নলহাটি শহর পরিক্রমা করে।

ভর্তি কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়

শুধু মেডিকেলেই নয়, মেধাতালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়ে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের পেছন দরজা দিয়ে এস এফ আই পরিচালিত ছাত্রসংসদ ও প্রিন্সিপালের যোগসাজসে ভর্তি করানো হয়েছিল দক্ষিণ বারাসাত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজে। এই ঘটনা নিয়ে এ আই ডি এস ও প্রতিবাদে সামিল হলে প্রিন্সিপাল অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেন। এই ঘটনায় অধ্যাপকরা হন হতবাক, ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ। প্রতিবাদী অধ্যাপকরা বাইরে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করলে এস এফ আই হামলা চালায় এবং অশালীন আচরণ করে। অবিলম্বে কলেজ খোলার দাবিতে এ আই ডি এস ও সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন দেয়। ২৪ সেপ্টেম্বর কলেজ ক্যাম্পাসে স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষ, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অতপর ৩০ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ কলেজ খুলতে বাধ্য হয়। বেশি নম্বর পাওয়া বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির দাবি মানতে টালবাহানা করতে থাকলে এ আই ডি এস ও ৪ অক্টোবর পরিচালন কমিটির সভাপতিকে ঘেরাও করে। পরে তাদের ভর্তির দাবি মেনে নিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

কলকাতায় ডি ওয়াই ও'র আলোচনা সভা

'সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে' — এই নামে বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বইটির উপর প্রশ্নোত্তরে একটি স্টাডি ক্লাসের আয়োজন করেছিল ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটি। ২ অক্টোবর চেতলার কৈলাশ বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত এই সভা পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী ও অন্যান্য যুবনেতৃবৃন্দ। ২৭ সেপ্টেম্বর মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াও ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

সরকারি বৃত্তি পরীক্ষা নিছক প্রহসন

উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ছে

১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে রাজ্যের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের নাম করে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে তার ফলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি, পাশ-ফেল সহ চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষাও তুলে দেওয়া হয়। পরিণতিতে রাজ্যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পুনরায় এ রাজ্যে ইংরেজি শিক্ষা ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে আসা নয়, আগে ছিল সরকারিভাবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে, বর্তমানে ফিরে এসেছে একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকে। যদিও ইংরেজি বইগুলির মান আশানুরূপ নয় এবং ইংরেজি শিক্ষাদানের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিও শিক্ষার অনুকূল নয়, তথাপি একটি সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে এই অধিকার ফিরিয়ে আনা — গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব জয় — যা নিয়ে এ'রাজ্যের সমস্ত মানুষ গর্বিত।

ইংরেজি শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেও অদ্যাবধি পাশ-ফেল প্রথা চালু করার ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণরূপে নীরব। শুধু নীরব নয়, এখনও চূড়ান্তরূপে তার বিরুদ্ধতা করে চলেছে। অথচ সরকার ভালভাবেই জানে, পাশ-ফেল প্রথা না থাকায় শিক্ষার মানের ক্রমাগত অবনমন হচ্ছে। ওরা যতই অগ্রগতির ঢাক বাজাক না কেন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ রাজ্য ক্রমাগত শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। একসময় পশ্চিমবাংলা শিক্ষায় ছিল অগ্রগণ্য রাজ্য। গোটা ভারতবর্ষ তাকিয়ে থাকতো এ রাজ্যের দিকে, কিন্তু আজ এ রাজ্য শিক্ষায় চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত, পিছন দিক থেকে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। শুধু মানে পিছিয়ে পড়া নয়, শিক্ষা সম্প্রসারণেও এ রাজ্য বহু রাজ্যের থেকে পিছনে।

একসময় রাজ্য সরকার জোর গলায় প্রচার করেছিল — ইংরেজি ভীতির কারণে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, পাশ-ফেল প্রথা থাকার কারণে ফেল হওয়ার জন্য এ রাজ্যে ড্রপ আউটের হার বাড়ছে, ইত্যাদি। কিন্তু এখন ইংরেজি ফিরিয়ে আনার পর আর ইংরেজি ভীতির কথা এদের মুখে শোনা যাচ্ছে না। বরং মুখ্যমন্ত্রী থেকে অন্য অনেকেই জোর গলায় ইংরেজির পক্ষে সওয়াল করে চলেছেন। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ! কিন্তু পাশ-ফেল প্রথা সম্পর্কে এখনও তাঁরা পুরানো বস্তাপচা নীতিকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। এখনও তাঁরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেন। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রথাকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেন।

কে আপত্তি করছে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করার বিষয়ে? এতো হওয়াই উচিত। কিন্তু কে করবে তা? সারা বিশ্বে আর কোথায় মাত্র ১ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চলে এবং ৪-৫টা ক্লাস তাঁকে একা চালাতে হয়, কিংবা ২০০/২৫০ বা ততোধিক ছাত্রছাত্রীকে মাত্র একজন বা দু'জন শিক্ষক পড়ান? শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কি বিশ্বের অন্যান্য দেশে এরকম? নাকি ভিন্ন চিত্র? তাহলে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের বেলায় বিশ্বের উদাহরণ, আর শিক্ষক কম থাকার বেলায় টাকার অভাবের অজুহাত — এই দ্বিচারিতা কেন? কোথায় আছে — যেখানে সারা বছর ছাত্রছাত্রীরা বই পায় না, বিনা বইয়ে তাদের মূল্যায়ন পর্ব সমাপ্ত হয়? কোথায় আছে — যেখানে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন বা দু'জন শিক্ষক থাক সত্ত্বেও তাঁদেরকেই সারা বছর নানা ট্রেনিং এবং বাইরের বিভিন্ন ধরনের কাজে লিপ্ত থাকতে হয়? সারা বিশ্বে কোথায় আছে যেখানে একজন শিক্ষক — তিনি মিড ডে মিলের কাজ তদারকি করেন, আবার সম্পূর্ণ শিক্ষাদানও করেন? এছাড়া নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন নীতির সঙ্গে পাশ-ফেল প্রথার বিরোধ কোথায়? নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের পর যদি দেখা যায়, কোন ছাত্রছাত্রী আশানুরূপ মান অর্জন করতে পারল না — তখনই তো তাকে আটকে রাখার প্রশ্ন আসছে। এর সঙ্গে তো নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের কোন বিরোধ নেই ! সেখানে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই বুঝবেন ছাত্রের দুর্বলতা কোথায় এবং সেটা পূরণের জন্য সকলে সচেষ্ট হবেন। তবেই তো তার ঘাটতি পূরণ হবে। নাকি জোর করে উঁচু ক্লাসে তুলে দিলেই তার ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে? এতো সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। অথচ একেই তাঁরা যথার্থ বিজ্ঞান বলে চালাতে চাইছেন এবং এতকাল ধরে তাই করা হচ্ছে।

পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিলেই নাকি ড্রপ আউট কমবে! একথা ওঁরা পূর্বেও বহুবার বলেছেন এবং এখনও বলছেন। অথচ ওঁদের দেওয়া তথ্য কী বলছে? প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ২৭/২৮ লক্ষ ছেলেমেয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩/১৪ লাখে। এক বছরেই প্রায় অর্ধেক। চতুর্থ শ্রেণীর শেষে গিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৯/১০ লাখে। আর মাধ্যমিকে গিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে ৬/৬·৫ লাখে। তাহলে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে ড্রপ আউট কমবে বলে যা বলা হয়েছিল তা ধোপে টিকল কি? আসলে এগুলি সম্পূর্ণ বানানো মনগড়া কথা। এর সঙ্গে সত্যের বা বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। ড্রপ আউটের মূল কারণ যে দারিদ্র, তা দূর করার কোন চেষ্টা না করে কিছু টোটকা দিয়ে, এবং মনগড়া কথা বলে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির হীন অপচেষ্টা চলছে। পরিণতিতে শিক্ষা এ রাজ্যে ক্রমাগত পিছোচ্ছে এবং সঙ্কুচিত হচ্ছে।

এই একই অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সরকার চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা (বা প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা) তুলে দিয়েছিল। '৭৭ সাল থেকে এই বৃত্তি পরীক্ষা তুলে দেওয়ার সময়ও সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন — এই ধরনের এক্সটারনাল পরীক্ষা বা পাবলিক একজামিনেশন শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুতরাং এসব জিনিস পরিত্যজ্য। অথচ এ রাজ্যের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ কোনমতেই সরকারের এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। বারে বারে প্রতিবাদ উঠেছে নানা মহল থেকে। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। অবশেষে ১৯৯২ সালে এ রাজ্যের বহু শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের সাথে অভিভাবক ও ছাত্রসমাজ একত্রিত হয়ে বিকল্প পরীক্ষা ব্যবস্থার আবেদন জানালেন। গড়ে উঠল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ। শুরু হল বেসরকারিভাবে চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা। প্রথম বছর ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী দিয়ে পরীক্ষা শুরু হল। পরবর্তী ক্ষেত্রে তা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে বর্তমানে সওয়া তিন লক্ষে এসে পৌঁছেছে। এই পরীক্ষার বিপুল জনপ্রিয়তা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। যারা বলেছিল এই ধরণের এক্সটারনাল বা পাবলিক একজামিনেশন শিশু মনোবিজ্ঞান বিরোধী — তারাই হঠাৎ করে '৯৯ সালে চতুর্থ শ্রেণীর আরও নীচে আরও কমবয়সী ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক্সটারনাল ইভ্যালুয়েশন চালু করে দিল। এটা তারা কেন করল, বা এটা কোন্ শিক্ষাবিজ্ঞান রীতি, বা এটা কোন্ কমিশনের সুপারিশ — তার কোন ব্যাখ্যা তারা অদ্যাবধি দেয়নি। তারা প্রথমে ভেবেছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর এই বহির্মূল্যায়ন দিয়েই উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষাকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে। সেভাবেই তারা চলছিল। কিন্তু প্রথম বছর থেকেই এই পরীক্ষাকে নিয়ে নানা দুর্নীতি এবং চরম অব্যবস্থার যেসব অভিযোগ উঠতে শুরু করে তা কার্যত পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করে দেয়। সরকারের অনুগামীরাও বলতে শুরু করেন — এটা আদপে কোন পরীক্ষাই নয়, সম্পূর্ণ প্রহসন।

অতঃপর সরকার গত শিক্ষাবর্ষে (২০০৪-০৫) একেবারে হঠাৎ করে শুরু করল চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা। কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষা বা প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা নামে নয়, নতুন নামকরণে এল এই পরীক্ষা — 'ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট'। কেমন রূপ এই পরীক্ষার? ওদের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের তিনটি পর্বের মধ্যে শেষ পর্বের মূল্যায়নের তারিখ বলা হয়েছিল ৮-১৮ এপ্রিল '০৫। ফলে 'ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট'-এর তারিখ ঘোষণা হল ১৯-২১ এপ্রিল। সকলেই জানেন — স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা বা তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন শেষ হওয়ার আগেই ছেলেমেয়েরা পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয়-তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভর্তিও হয়ে যায়। এদিকে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়নে সব ছেলেমেয়েরা বসল, পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিল, আবার সেই সরকারের আহ্বানে চতুর্থ শ্রেণীতে আর একটি পরীক্ষায় বসতে হল। ছাত্রছাত্রীরা কী ধরণের জীব যে তাদের নিয়ে যেমন খুশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে? গিনিপিগ নিয়েও তো বোধহয় এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় না, যতটা হয় বিনা পয়সার সরকারি বিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে।

তারপর কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হল? যাঁরা পরীক্ষার এত বিরোধী, তাঁরা তিনদিনে পরীক্ষা শেষ করার জন্য ছোট ছোট শিশুদের মাথায় একদিনে দুটো করে পরীক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের বলা হল — পরীক্ষার হলে তাঁদের নজরদারি করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ জায়গায় এবং শহরাঞ্চলের কোথাও কোথাও এক-একজন শিক্ষককে দুটো শিফ্‌টেই পরীক্ষার হলে নজরদারি করতে হয়েছে। এরপর তাঁদের বলা হল সঙ্গে সঙ্গে বসে খাতা দেখে দিতে হবে। কী অমানুষিক নির্যাতন! মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা নয়। সারাদিন পরীক্ষা হলে ডিউটি দিয়ে তারপর খাতা দেখতে বহু জায়গায় রাত হয়ে গেছে, এমনকী মহিলা শিক্ষিকারা অনেক রাত পর্যন্ত বহু জায়গায় হ্যারিকেন বা লণ্ঠনের আলোতে খাতা দেখতে দেখতে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে তাঁদের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু সরকারি ফরমান অদ্ভুত! কোন নিস্তার নেই। এভাবেই তাঁদের পরপর তিনদিন ডিউটি দিতে বাধ্য করা হল। এদিকে রয়েছে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়নের খাতা — যে পরীক্ষা শেষ করেই তাঁরা 'ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট'-এ ডিউটি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ খাতা দেখবেন কখন এবং তার রেজাল্ট কখন বেরোবে? এসব নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যথা ছিল কি?

কিন্তু এত করে যে খাতা দেখানো হল, সেই 'ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট'-এর রেজাল্ট কোথায়? দীর্ঘ ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও অদ্যাবধি তার রেজাল্ট বেরোয়নি এবং তা আর কোনদিন বেরোবে না। কারণ এর পরে এই ছেলেমেয়েরা পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে যাবে। তখন এই রেজাল্ট তাদের কোন্ কাজে লাগবে বা এর জন্য কোনও আকর্ষণ থাকতে পারে কি? এছাড়া সংবাদে জানা গিয়েছে, এত করেও তাঁরা ৬০ শতাংশের বেশি খাতা দেখতে পারেননি। বহু জায়গায় খাতা আজও অবহেলায় পড়ে আছে — নেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাহলে এই পরীক্ষা নেওয়ার তাৎপর্য কি? নিছক লোকদেখানো, নাকি যেন-তেন-প্রকারেণ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের জনপ্রিয় বৃত্তি পরীক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা?

এ তো গেল পরীক্ষার একটা দিক। বাকি দিকগুলো কেমন একটু খতিয়ে দেখা যাক। প্রশ্নপত্রের ধরন কেমন? উত্তর লিখতে হবে প্রশ্নপত্রের মধ্যেই। কেন? বাইরে প্রশ্ন গেলে সকলে দেখে ফেলবে, গণ্ডগোল থাকলে ধরে ফেলবে? বেশিরভাগ প্রশ্ন অবজেকটিভ টাইপ-এর। 'হ্যাঁ'-'না' বা 'টিক' মারার ব্যাপার — লেগে গেলে নম্বর। কিছু জানুক বা না জানুক আন্দাজে লেগে গেলেই হবে। এতো কারচুপির ব্যাপার! বই পড়া এবং তার ভিত্তিতে কতটুকু জানা গেল তার বিচারের সুযোগ কোথায়?

তারপরেও রয়েছে — প্রশ্ন এবং মডেল উত্তরে অসংখ্য ভুল। যেমন, 'আহ্নিক গতিতে ঋতু পরিবর্তন হয়', 'শুকতারায় চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখা যায়'। আবার অভিযোগ উঠেছে,

বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হবে ২০০৬-এর ৬ ফেব্রুয়ারি। ১০ ডিসেম্বর '০৫ পর্যন্ত ফরম জমা দেওয়া যাবে। বাংলা ও হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির চতুর্থশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে। ৬ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা-সাহিত্য, ৭ ফেব্রুয়ারি গণিত, ৮ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস- ভূগোল, ১০ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত শিক্ষাবর্ষে প্রায় সওয়া তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল, যাদের মধ্যে ৫০০ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে মোট সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল।

পর্ষদের দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ের সাথে প্রশ্নের মিল নেই। যেমন, 'সন্ধ্যায় যে তারাকে মাথার উপরে দেখা যায়, মাঝরাতে তাকে কোথায় দেখা যাবে?' 'আমাদের দেশে যখন সন্ধ্যা তখন আমেরিকায় সময়কালটা কেমন হবে?' এমনতর বিষয়ের ধারণাগুলি আদৌ বই-এর পাতাতেই নেই। এমন বোধমূলক ধারণাগুলি বইয়ে নেই। এক জায়গায় জানতে চাওয়া হয়েছে, 'অজানা কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করার আগে কী সতর্কতা নেওয়া উচিত?' প্রশ্নের চেয়ে উত্তরের চমক আরো বেশি। উত্তর সঙ্কেতে বলা হয়েছে, 'বড়দের কাছে জেনে নিতে হবে'। চতুর্থ শ্রেণীর প্রকৃতি বিজ্ঞানে রুই মাছের ছবি বলতে বইয়ের তিন পৃষ্ঠায় সাদামাটা একটি রুই মাছের ছবি আছে। কিন্তু রুই মাছের ছবি এঁকে কানকো, পিঠের পাখনা, শ্রোণি পাখনা তিরচিহ্ন দিয়ে দেখাতে বলা হয়েছে। এমন অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বিষয় এবং ভুল তথ্যগুলি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিকট বিভ্রান্তিকর নয় কি? প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রে ট্রাফিক আইনের লাল আলো বা সবুজ বাতি অথবা জেব্রা ক্রসিং দেখে তো বহু শিক্ষকই চমকে উঠেছেন। পাঠ্যপুস্তকে এমন ধারণা পাওয়া তো দূরে থাক, বাস্তব জীবনেও রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা রাজ্যের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দেখেনি। পাড়াগাঁয়ের যে অবোধ শিশুটি কোনদিনই বড় শহরে ঘোরার সুযোগ পায়নি, তার কাছে এ প্রশ্ন হতাশাজনক নয় কি? ফলে সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ করলে এই পরীক্ষা কার্যত ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে একটা প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

এর সঙ্গে রয়েছে মূল্যায়নের নম্বর বসানোর নির্ধারিত ছকেও বহু রকম ভুল ও বিভ্রান্তি। এর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর শব্দবোধ, বাক্যবোধ ইত্যাদির পার্সেন্টেজ কষা প্রভৃতি নানা জটিল কাজ করতে শিক্ষকরা গলদঘর্ম হয়েছেন। এমনকী বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তারাও ঘেমে নেয়ে গেছেন এবং বলা বাহুল্য, এই ধরনের জিনিস আদৌ কোন কাজে লাগবে না এবং অচিরেই তা ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবে। তবুও মানুষকে খাটিয়ে মারা এবং লোককে দেখানো — সরকার

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমেরিকায় ক্ষুধার্ত মানুষ বাড়ছে

''আমেরিকাতে খিদের জ্বালায় ছটফট করা মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তৃতীয় বিশ্বের কাছে 'সব পেয়েছির দেশ', 'স্বপ্নের দেশ' বলে চিহ্নিত হলেও সাম্প্রতিক সমীক্ষায় যে তথ্য জানা গিয়েছে তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। গত পাঁচ বছরে আমেরিকায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তেতাল্লিশ শতাংশ হারে। ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারের গবেষকরা এই তথ্য পেশ করে একই সঙ্গে সাবধান করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, উত্তরোত্তর এই ক্ষুধার্তের তালিকায় সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে শিশুদের। ইউ এস ডি এ'র প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ভাল করে পেট ভরে খেতে পায় না, এমন আমেরিকানদের সংখ্যা এই মুহূর্তে তিন কোটি বিরাশি লক্ষ। এর ভিতর এক কোটি চল্লিশ লক্ষ শিশু।

সায়েন্স পোর্টাল ইউরেক অ্যালার্টের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের পর থেকে খোদ আমেরিকায় ক্ষুধার্তের সংখ্যা বেড়েছে সত্তর লাখ। ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের ভিতর ক্ষুধার্ত আমেরিকান পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে দশ লাখ।''

এই হল সমাজের একেবারে নিচুতলায় থাকা নিঃস্ব মানুষের জীবনচিত্র। কিন্তু যারা এর চেয়ে উপরের দিকে রয়েছে, যাদের নিম্নমধ্যবিত্ত, এমনকী মধ্যবিত্তের গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়, অন্তত সাধারণ গড় আয় থেকে যারা বেশি আয় করেন, তাদের অবস্থা কেমন? আমেরিকায় একটি চালু কথা ছিল ''মিডলক্লাস ড্রিম'' বা মধ্যবিত্তের স্বপ্নের জগৎ, — ভোগবিলাসের জগৎ। যার হাতছানি ওখানে মধবিত্তকে অর্থের পিছনে দৌড় করায়। শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে হোক, কিংবা ব্যাঙ্ক, না হয় অন্য কোন ঋণদাতা সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে হোক, মধ্যবিত্তকে 'স্বপ্নের জগতে' পৌঁছাতে উৎসাহ দিয়ে এসেছে মার্কিন দেশের পুঁজিবাদী শাসকরা। এ হল অনেকটা ঋণ করে ঘি খাওয়ার মতো। এতে ঘিয়ের বিক্রি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়, ঘি ব্যবসায়ীদের মুনাফার থলি ভরে ওঠে। ''ভোগ করো, ভোগ করে যাও, ঋণে ডুবলেও ভোগ করে যাও, ওতেই মোক্ষলাভ হবে'' — এই হচ্ছে মার্কিন পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির মন্ত্র, যেটা অহর্নিশি মার্কিন জনতাকে শুনিয়ে মার্কিন পুঁজিবাদ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে মানুষের মধ্যে ভোগের বাসনা বাড়িয়ে তুলে চাকা চালু রাখার চেষ্টা করছে।

আবার আমেরিকার সকল ঋণগ্রহীতা মানুষই যে ভোগবিলাসের জন্য ঋণ করছে, তা নয়। ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়, বহু দরিদ্র মানুষ শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই, সুযোগ থাকলে ঋণ করেছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র, যারাই ঋণ নিয়ে থাক, তাদের সেই ঋণ পরিশোধ তো করতে হয়? সেটা সম্ভব হয় কীভাবে? এ ব্যাপারে একটা আইন ওদেশে ছিল। ঋণ নিয়ে যারা তা শোধ দিয়ে ব্যর্থ হত তারা কোর্টে গিয়ে নিজেদের 'দেউলিয়া' বলে ঘোষণা করলে, ঋণ পরিশোধ থেকে রেহাই পেত। বিনিময়ে অত্যাবশ্যক নয় এমন জিনিসপত্র ঋণদাতা কোম্পানিকে দিলেই চলত। এর দ্বারা প্রমাণিত হত তারা নিঃস্ব, দেউলিয়া অতএব, বাকি টাকা আর দিতে হত না।

জর্জ বুশের সরকার এখন ওই আইন বদলে দিয়ে নতুন আইন করেছে, যার ফলে এভাবে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে ঋণের টাকা শোধ দেওয়া থেকে আর রেহাই পাওয়া যাবে না। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পর্যন্ত এবার ছাড়ের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে, ঐ পরিমাণের ওপরে যাদের ঋণ হবে, তা শোধ না দিতে পারলে পাওনাদারদের কবলে পড়ে ভিটেমাটি খুইয়ে এবার সর্বস্বান্ত হতে হবে ঋণগ্রহীতাদের। গত ১৭ অক্টোবর ছিল পুরানো আইনটি বহাল থাকার শেষ দিন। দেখা গেল, ঐ দিনটি আসার আগেই নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করিয়ে নেওয়ার জন্য আমেরিকার কোর্টগুলিতে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। এই ঘটনাই ধনী আমেরিকার সাধারণ মানুষের করুণ আর্থিক অবস্থাকে দুনিয়ার সামনে আবারও উন্মোচিত করে দিল।

লুডকুইস্ট কন্সালটিং ইনকর্পোরেটেড নামে একটি সংস্থা হিসাব দিয়ে জানিয়েছে যে, আগে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টগুলিতে নিজেদের দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা করাতে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৪ হাজার মানুষ আসত, সেখানে নতুন আইনের কবল এড়াতে ১৭ অক্টোবরের আগের সপ্তাহে কোর্ট চত্বরে ভিড় জমিয়েছেন দৈনিক গড়ে ২৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। বস্তুত এই অসহায় মানুষগুলির ভিড়ে সেদেশের আদালতগুলিতে অন্যান্য কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ভারতবর্ষের মতো দেশগুলির সাধারণ

সাতের পাতায় দেখুন

ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়ার প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

একের পাতার পর

একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই সুযোগে বিশ্বের বাজারে ভাগ-বাঁটোয়ারায় আরও জায়গা করে নিচ্ছে, এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সুপার পাওয়ার হিসাবে ভারত স্বীকৃতি আদায় করছে। এইগুলি দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও গণআন্দোলনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। একদা বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ বলে পরিচিত এই পশ্চিমবঙ্গে এমন সময় এই মহড়া হচ্ছে যখন সিপিএম দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আসীন। রাজ্য সরকার আপত্তি করলে নিশ্চয়ই এটা ঘটতে পারত না।

এটাও জানা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তার ভিত্তিতেই ঠিক হয়েছে, সিপিএম বাইরে যতই বিক্ষোভ দেখাক, ভারত-মার্কিন সামরিক বিমান মহড়া নির্বিঘ্নেই ঘটতে পারবে। একথাও পরিষ্কার, সিপিএম যেভাবে চাপ দিয়ে ভেল-এর বিলগ্নীকরণ স্থগিত করাতে পেরেছে, সেভাবে চেষ্টা করলে, এমনকী প্রয়োজনে সমর্থন প্রত্যাহারে চাপ দিলে কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক চুক্তি বাতিল ও যৌথ বিমান মহড়া বন্ধ করতে অবশ্যই বাধ্য হত। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব আজ শুধু ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিই নয়, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থার সাথেও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে, সেজন্যই মার্কিন পুঁজি নিয়ে আসার লালসায় এমন রাস্তা নিয়েছে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। অর্থাৎ সামরিক মহড়া যথারীতি চলবে এবং সিপিএমও কর্মী ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যথারীতি বিক্ষোভের মহড়া চালাবে। এভাবেই সিপিএম নেতৃত্ব শুধুমাত্র গদিতে টিকে থাকার স্বার্থে বামপন্থা, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে।

ক্ষমতাসীন দল ও সরকারগুলির এই দেউলিয়া ভূমিকার ফলে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ দেশের মধ্যে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছে, সে সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন হতে এবং সামরিক চুক্তি ও যৌথ বিমান মহড়ার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ লাগাতার প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আবেদন জানাচ্ছি।

আওয়াজ তুলুন ঃ

১। **যুদ্ধবাজ, গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-মানবতার চরম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত সরকারের সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে।**

২। **ইরাক ও আফগানিস্থানের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত সরকারের সামরিক সমঝোতা চলবে না।**

৩। **মার্কিন-ভারতীয় যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ করতে হবে।**

৪। **কলাইকুন্ডায় মার্কিন-ভারতীয় যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ করতে হবে।**

৫। **কলাইকুন্ডায় মার্কিন-ভারতীয় যৌথ সামরিক মহড়া করতে দেওয়া হল কেন — রাজ্য সরকার জবাব দাও।**

৬। **সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে।**

৭। **ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সামরিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চুক্তি করা চলবে না।**

৮। **ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যকে অপমান করা চলবে না।**

৯। **মার্কিন পুঁজির লোভে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বামপন্থার বিপদ সৃষ্টি করা চলবে না।**

১০। **ভারত-মার্কিন সামরিক সমঝোতা বাতিলের দাবিতে দলমত নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধ লাগাতার প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলুন।**

সপ্তাহব্যাপী এলাকায় এলাকায় পথসভা, বিক্ষোভ

১২ নভেম্বর — রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

২৪ নভেম্বর — মহাজাতি সদনে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে এস ইউ সি আই-ও সামিল হবে

১০ ঘণ্টা খাটিয়ে ৭ ঘণ্টার বেতন, বিনাবেতনে ওভারটাইম

নির্মম শোষণের শিকার আমেরিকার রেস্টুরেন্ট কর্মচারীরা

বিশ্বপুঁজিবাদের সোনার দেশ মার্কিন মুলুকের প্রাণকেন্দ্র নিউ ইয়র্ক সিটিতে ১৫০০০ রেস্টুরেন্ট এবং খাবারের দোকানে কর্মরত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার কর্মচারী বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংগঠিত হচ্ছেন। নিউ ইয়র্ক শহরে খাবারের ব্যবসা বিরাট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বৃহৎ খাদ্যব্যবসায়ীর দোকানও রয়েছে শহরে। বছরে এই ব্যবসায় আটশো কোটি ডলার বেচাকেনা হয় যা ২০১০ সালে ১৩০০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে বলে অনুমান। অথচ অধিকাংশ কর্মচারীই সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি পান না।

নিউ ইয়র্ক শহরের এই বিশাল সংখ্যক রেস্টুরেন্ট কর্মচারীর ৯০ শতাংশই অসংগঠিত এবং ৬৭ শতাংশ হল অভিবাসী, অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ, মেক্সিকান, স্পেনীয় বংশোদ্ভূত বা ঐ ধরনের কিছু। এঁদের ৮০ শতাংশ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরি পান না, ৬০ শতাংশের আইনানুগ বেতনবৃদ্ধি করা হয় না, ৫৯ শতাংশকে বিনা বেতনে ওভারটাইম খাটানো হয়, ৯০ শতাংশের কোন স্বাস্থ্য বীমা নেই।

দেড়শো বছর আগে কার্ল মার্কস, তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব দিয়ে পুঁজিবাদী মুনাফার বর্বর মূল উৎসটি দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন মুনাফার পিছনে কোন মানবতা বা ন্যায্যতা থাকতে পারে না। মার্কস দেখিয়েছিলেন, মুনাফাবৃদ্ধির অন্যতম যে উপায়টি মালিকরা কাজে লাগায়, তা হল কর্মদিবসের মেয়াদ বৃদ্ধি করা। ''বিশ্বায়নের যুগে পুঁজির চরিত্র বদলে গিয়েছে'' এবং ''মার্কসবাদ সেকেলে ও অচল হয়ে গিয়েছে'' বলে যাঁরা ফতোয়া দিচ্ছেন, নিউ ইয়র্কে গেলে তাঁরা দেখতে পাবেন রেস্টুরেন্ট শ্রমিকরা দিনে ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা খাটেন কিন্তু বেতন পান ৭ ঘণ্টার। সুবৃহৎ পার্ক এভিনিউ কাফের সহকারী বাবুর্চি জুলিও আঞ্জুরেস সাংবাদিকদের বলেছেন, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা খেটে তিনি ৪০ ঘণ্টার বেতন পান। এর ওপর বাড়তি আছে বর্ণবিদ্বেষী লাঞ্ছনা।

নিউ ইয়র্ক শহরের অসংগঠিত পোষাক শিল্পে ৬৪%, নির্মাণশিল্পে ৫৮%, খাদ্য পরিবেশনকারীদের ৫৪%, মুদিখানা ও বিভাগীয় বিপনীতে ৫০%, পরিবহন এবং গুদাম কর্মচারীদের ৫০% হল অভিবাসী শ্রমিক।

সংগ্রামী শ্রমিক জোয়ান মার্টিন রিয়েস ভারেলা বলেছেন — ''ইতালীয়, ফরাসি এবং মার্কিন, সবরকম রেস্টুরেন্টেই আমি কাজ করেছি, সর্বত্রই আমার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আমার চুলের রং, গায়ের রং, এমনকী উচ্চারণের জন্যও আমি জাতিবিদ্বেষী অপমানের শিকার হয়েছি।''

২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ১০৮ তলায় ছিল 'উইনডোজ অব দি ওয়ার্ল্ড' রেস্টুরেন্ট। ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ঘটনায় এই সংস্থার ৭৩ জন কর্মচারী মারা যান। কমহীন বাকি ৩৫০ জন কর্মচারীকে সাহায্য করার জন্য গড়ে ওঠে রেস্টুরেন্ট অপারচুনিটিজ সেন্টার অব নিউইয়র্ক (আর ও সি এন ওয়াই)। এই সংগঠন প্রচার, জনমত গঠন, বিক্ষোভ প্রদর্শন, কানুনি লড়াই সবরকম পথেই ২৩ জন কর্মচারীর ওভারটাইম পাওয়ার দাবিতে লড়াই করে দুটি ফ্যাসনেবল ম্যানহাটন রেস্টুরেন্ট মালিকের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ডলার আদায় করেছে। ইতিমধ্যেই সহস্রাধিক শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। নিউ ইয়র্কের বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদপত্র 'ক্রাইনস' মন্তব্য করেছে — ''একটি ক্ষুদ্র সংগঠন শহরের রেস্টুরেন্ট শিল্পে অদম্য শক্তি হিসাবে জেগে উঠছে।''

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বহু রেস্টুরেন্ট ছিল, যেগুলি ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পর আর খোলেনি। ফলে বহু রেস্টুরেন্ট কর্মচারী কর্মহীন। এঁদের কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ৩ অক্টোবর আর ও সি এন ওয়াই একটি শ্রমিক সভা সংগঠিত করে। ওই সময় আমাদের দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী আমেরিকায় ছিলেন। আর ও সি এন ওয়াই-এর পক্ষ থেকে তাঁকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কর্মচ্যুত মার্কিন শ্রমিকদের এই সভায় কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁদের সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় সংগ্রামী শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সংহতি জ্ঞাপন করেন।

আমেরিকার বেকার যুবকরাও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাইছেনা

''সামরিক বাহিনীতে যোগ দিন, এর থেকে বড় কাজ আর নেই'' — সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে এই বাণী বিতরণ করেছেন দুনিয়ার স্বনিযুক্ত অভিভাবক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। আমেরিকার যুবকরা কিন্তু এই ধরনের বাণীতে মোটেই উৎসাহবোধ করছে না। ''সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে'' বিশ্বব্যাপী লড়াই এবং গণতন্ত্র রপ্তানির মহৎ ব্রতসাধনের কাহিনী শুনিয়েও বুশ সাহেবরা মার্কিন জনগণকে তথাকথিত দেশপ্রেমের বটিকা গেলাতে পারছেন না। সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে যুবক-যুবতীদের প্রচণ্ড অনীহা দেখা দিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, যথেষ্ট বেকারি থাকা সত্ত্বেও নতুন সেনা নিয়োগের ক্ষেত্রে গতবছর যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল বাস্তবে তার ৬০ শতাংশ মাত্র নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ইরাকে মোতায়েন মার্কিন ন্যাশানাল গার্ড গত ১৮ মাসের মধ্যে ১৭ বার তাদের মাসিক সেনা নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। ইরাকি দেশপ্রেমিকদের হাতে নিহত মার্কিন সেনার সংখ্যা দু'হাজার পার হয়েছে। এ বছর ৮০ হাজার নতুন সেনানিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করা যাবে না বলেই মার্কিন সামরিক কর্তারা মনে করছে। সামরিক বাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল পিটার শুমেকার মার্কিন সিনেটে বলেছেন, ''নতুন সেনানিয়োগের অবস্থা খুব খারাপ, আগামী বছর পরিস্থিতি শোচনীয় হবে।'' মার্কিন বাহিনীতে আফ্রো-আমেরিকান (কৃষ্ণাঙ্গ) এবং মেয়েদের নিয়োগই কমেছে সব থেকে বেশি। ২০০০ সালে আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্য থেকে যত নতুন সেনানিয়োগ করা হয়েছিল এ বছর সেই হার কমেছে ১৪ শতাংশ। ঐ একই সময়ে মেয়েদের নিয়োগের হার ২২ শতাংশ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে।

মার্কিন বাহিনীতে যত সেনা আছে তার ৭ শতাংশ বিদেশি। যেটা সংখ্যায় প্রায় ৩০ হাজার। তৃতীয় বিশ্বের ছোটখাট দুর্বল একশ'টি দেশের নাগরিকদের মার্কিন সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এটা নতুন নয়, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এভাবেই নেপাল থেকে গোর্খা সৈন্য নিয়োগ করা হতো। এসব দেশের নাগরিকদের মার্কিন বাহিনীতে নিয়োগকে উৎসাহিত করতে গত ২০০২ সালে রাষ্ট্রপতি বুশ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার টোপ ফেলেছেন। বলা হয়েছে, এই ধরনের বিদেশি নাগরিকেরা মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হলে সাথে সাথে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তাঁদের মৃত্যু হয় তবে অন্যান্য আর্থিক সাহায্য ছাড়াও তাঁদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু এসব টোপ দেওয়ার পরও বিদেশি নাগরিকদের মার্কিন বাহিনীতে প্রবেশের হারও কমছে দ্রুতহারে। পরিসংখ্যান বলছে ২০০১ সালের তুলনায় বিদেশি নাগরিকদের মার্কিন বাহিনীতে প্রবেশের হার কমেছে ২০ শতাংশ।

আমেরিকার সম্পন্ন নাগরিকেরা তো সামরিক বাহিনীতে ঢুকতে চাইছেনেই না। সমস্যা জর্জরিত সাধারণ মানুষকে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করতে তাঁদের সামনে ডলারের থলির প্রলোভন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাহিনীতে নাম লেখালেই তিন বছরে ৯০ হাজার ডলার বোনাস। চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার নাম লেখালে বোনাস দেওয়া হচ্ছে কমপক্ষে দেড় লক্ষ ডলার। তবুও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

যুদ্ধে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, প্রচার মাধ্যমে তাঁদের বীরত্বের গাথা জোরকদমে প্রচার করা হচ্ছে। ইরাক থেকে যুদ্ধফেরত সেনাদের ঘটা করে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এসবের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে সাধারণ নাগরিকদের উৎসাহিত করা। কিন্তু এই কৌশলেও আর আগের মত কাজ হচ্ছে না। যুদ্ধফেরত সেনা এবং সাধারণ নাগরিকেরা সরকারি দেশপ্রেমের মিথ্যাচার ক্রমশই বেশি বেশি করে বুঝতে পারছে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় এই ধরনের একজন মার্কিন মেরিনের সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকার গণ্যমান্যেরা তাঁর অসীম বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে ভাষণ দেওয়ার পর সেই জওয়ান বলেছিলেন — ''আমি বীর নই। সমরযন্ত্রের আবশ্যিক নাটবল্টু আমরা। মার্কিন ধাঁচের চমৎকার জীবনধারা বজায় রাখতে আমাদের মতো কিছু উন্মাদ দরকার যারা অপরের ঘরে চড়াও হয়ে বোমা মারবে।''

শুধু যে নতুন সেনা নিয়োগেই সমস্যা হচ্ছে তাই নয়, পুরানোদের ধরে রাখাও বিরাট সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, নাম লেখানোর ৬ মাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করেছে। বাহিনীতে যোগ দেবার আগে তাঁদের সামনে কল্পনার যে স্বর্গরাজ্য রচনা করেছিল মার্কিন রাষ্ট্রনায়কেরা বাস্তবের সাথে তার বিস্তর ফারাক দেখে সেনারা হতাশ, পরিণামে ''তাঁদের খাওয়াদাওয়া বন্ধ, মুখে কিছু তুললেই বমি, সর্বদাই আতঙ্ক তাড়া করছে।'' সেনাবাহিনী ত্যাগ করে যাওয়ার ঘটনাও ক্রমাগত বাড়ছে, যা সেনাকর্তাদের পক্ষে অতীব লজ্জাজনক। পেন্টাগন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে — ইরাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৫৫০০ জন জওয়ান সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছে। ১৯৯৫ সালে বাহিনীত্যাগীর সংখ্যাটা ছিল ১৫০৯ জন। বাহিনী ত্যাগের যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সেনারা বলছে — তারা যুদ্ধবিরোধী, তাই বাহিনীর সাথে তারা আর থাকতে চায় না। যে সমস্ত জওয়ান বাহিনী ত্যাগ করতে চায় তাদের সাহায্য করার জন্য টেলিফোনে হটলাইন চালু হলে এ বছর ৩৩ হাজার সেনার কাছ থেকে কল পাওয়া গেছে — যারা প্রত্যেকেই ইরাক থেকে ফিরে যেতে চাইছে। কেন এমন হচ্ছে, তা সমীক্ষা করে দেখার জন্য মার্কিন সেনা কর্তারা 'মিলওয়ার্ড ব্রাউন' নামে এক কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অনুসন্ধান করে তারা বলেছে — ''সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনিচ্ছার মূলে রয়েছে ইরাক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপত্তি এবং সৈনিকবৃত্তির প্রতি বিমুখতা।'' মার্কিন জনগণ ক্রমশই বুঝতে পারছে — ইরাক যুদ্ধ জয় যত সহজে হবে বলে বুশ প্রশাসন দেশবাসীকে বুঝিয়েছিল তত সহজে তা হবার নয়। ইরাকে নিহত ও আহত মার্কিন সেনার সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। জনমত সমীক্ষা বলছে সেনাবাহিনীতে ছেলেমেয়ে পাঠাতে ইচ্ছুক অভিভাবকদের সংখ্যাও যুদ্ধ শুরুর পর যা ছিল তার অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। ইরাকি জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধের অসীম বীরত্ব এবং মার্কিন জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা — এই দুইয়ে মিলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই হল বাস্তব অবস্থা।

এর ফলে মার্কিন বাহিনীর লড়বার ক্ষমতাও ক্রমশ কমছে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে — বাহিনীর কর্তারা কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়েছে, শারীরিক সক্ষমতার অভাব বা ড্রাগের নেশা ইত্যাদি কারণে যেন সেনাদের বরখাস্ত করা না হয়। এমনকী ন্যস্ত দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে না পারলেও যেন সেনাদের সেই অক্ষমতা উদারতার সাথে বিচার করা হয়। এই উদারতা যে কোন্ প্রয়োজন থেকে আসছে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মার্কিন যুবকেরা সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে চাইছে না, অথচ সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের যুদ্ধ করে যেতে হবেই। কারণ, যুদ্ধ ওদের ব্যবসা, ওদের অর্থনীতির অক্সিজেন। তাই এই যুদ্ধের খিদে মেটাতে যুদ্ধে যোগ দিতে যুবকযুবতীদের উত্তেজিত করতে মার্কিন প্রশাসন এখন স্লোগান তুলছে — ''আমেরিকাকে রক্ষা কর, আমেরিকান হও।'' এই রকম স্লোগান তুলে মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স বুট সেনা রিক্রুটের সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য উপায় সুপারিশ করে বলেছেন, — ''যারাই একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে রাজি তাদেরই নাগরিকত্ব দিতে হবে, তা তিনি যেখানকার বা যে দেশের মানুষই হোন না কেন''। তিনি আরও বলেছেন — '' কোন বিদেশি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লড়ার জন্য সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারে? আমি মনে করি পারে। কারণ, বহু মানুষই এদেশে আসার জন্য মরিয়া, সেই সুযোগের বিনিময়ে কয়েক বছর সামরিক বাহিনীতে কাজ করা তাদের কাছে বেশি কিছু নয়। এও নিশ্চিত যে এভাবেই উদ্যমী, পরিশ্রমী অভিবাসীদের আমরা বাহিনীতে পাব। এটাই আমরা চাই।''

ভাবলে ভুল হবে, সেনাসঙ্কট নিয়ে কেবল আলোচনাই চলছে। নিত্য নতুন কৌশল বের করার কাজও চলছে সমানতালে। এর মধ্যে নবতম হল সেনা সংগ্রহের কোম্পানি খুলে দেওয়া। অর্থাৎ সরাসরি রাষ্ট্র নয়, সেনাসংগ্রহ করবে বিভিন্ন কোম্পানি এবং এইসব কোম্পানির কাছ থেকে মার্কিন রাষ্ট্র চুক্তির ভিত্তিতে সেনা নিয়োগ করবে এবং এখন হচ্ছেও তাই। দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্ (২-৪-০৫) লিখেছে — ''দুনিয়ায় এখন কয়েক ডজন, হয়ত কয়েক শত, বেসরকারি সামরিক-ঠিকাদার কোম্পানি কাজ করছে। একমাত্র ইরাকেই কাজ করছে দু'ডজন কোম্পানি, যারা ১৫ হাজার সেনাকে চুক্তিবদ্ধ করেছে।'' গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছে — ''নতুন রিক্রুটে যখন ঘাটতি চলছে তখন সমরসচিব এক- তৃতীয়াংশ রিক্রুটের ভার ছেড়ে দিয়েছেন বেসরকারি ঠিকাদার কোম্পানির হাতে।'' এই ধরনের বেসরকারি সামরিক ফার্মগুলি সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্তারাই প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। তাঁরা প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবকদের তৈরি করে রাষ্ট্রের কাছে ভাড়া খাটায়। কোথা থেকে আসে এই যুবকরা? মূলত হতদরিদ্র মার্কিন পরিবার, প্রধানত কৃষ্ণাঙ্গরা এবং আমেরিকায় বেআইনিভাবে ঢুকে পড়া তৃতীয় বিশ্বের পরিবারগুলি থেকেই এদের সংগ্রহ করা হয় এবং এজন্য কোম্পানিগুলি রীতিমত প্রশিক্ষিত দালাল নিয়োগ করে থাকে। সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের কাজে মানুষ ভাড়া খাটানোর ব্যবসাদার এই কোম্পানিগুলির বছরে আয় কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি ডলার। এই ব্যবসা ক্রমশই ফুলে ফেঁপে উঠছে। বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাও গড়ে উঠেছে — যারা বাজারে শেয়ার ছাড়ছে এবং লগ্নির উপর মোটা লভ্যাংশও দিচ্ছে।

দুনিয়াব্যাপী নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য এইভাবে মার্কিন সমরচক্র যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে নিজেদের দেশের ও অনুন্নত বিশ্বের যুবকদের কিনে নিয়ে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কাজে লাগিয়ে শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইছে, যা দেখলে তৈমুর, চেঙ্গিজ, আটিলা দি হুন লজ্জায় মুখ ঢাকতো।

(তথ্যসূত্র ঃ ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৩-৭-০৫ ও ২০-৮-০৫)

ডায়মণ্ডহারবারে কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির বিক্ষোভ

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মথুরাপুর, মন্দিরবাজার ও কুলপি থানার বিস্তীর্ণ এলাকা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের অতিবর্ষণে জলবন্দী হওয়ায় আমন চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে বিগত ষাঁড়াষাঁড়ির কোটালে নদীবাঁধ ভেঙে রায়দিঘি থানার নগেন্দ্রপুর, নন্দকুমারপুর, কুমড়াপাড়া অঞ্চলের কয়েক হাজার বিঘা চাষ করা জমি নোনা জলের বানে তলিয়ে গেছে। সমগ্র এলাকার হাজার হাজার চাষী ও মজুর পরিবার বিপন্ন, সর্বস্বান্ত। অপরদিকে, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির নির্বাচনী এলাকা জুড়ে পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদতে সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের তাণ্ডবে, মিথ্যা মামলায় জেরবার শত শত বিরোধী দলের কর্মীসমর্থক ঘরছাড়া। এর ওপর হাজির হয়েছে সালিম গোষ্ঠীর নগরায়ণ ও সড়ক নির্মাণের জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিপদ। মগরাহাট থানার কয়েক হাজার চাষী পরিবার ভিটামাটি ও জমিচ্যুত হওয়ার আতঙ্কে দিশাহারা। এইসব দুর্গত মানুষরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দরবার করে কোন সুরাহা না পেয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও মহকুমা শহর ডায়মণ্ডহারবারের পথে মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাঁচ সহস্রাধিক চাষী, ক্ষেতমজুর ও বিপন্ন অসহায় মা-বোনদের বিক্ষুব্ধ ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর শহরকে কাঁপিয়ে দেয়।

তাদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল সাতপুকুরিয়া ও পাটুনিঘাটা স্লুইস গেট সহ সমস্ত নিকাশি নদী খাল সংস্কার, চাষীদের ঋণ ও খাজনা মকুব, আগামী বোরো চাষের জন্য সেচের সুবন্দোবস্ত করা ও পর্যাপ্ত ঋণ অনুদান প্রদান, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও রিলিফ প্রদান, অবিলম্বে নদীবাঁধ সুউচ্চ ও সুদৃঢ় করে বাঁধা, বন্যাদুর্গতদের খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা সহ সর্বপ্রকার রিলিফের ব্যবস্থা করা, দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ করা, সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের সন্ত্রাস বন্ধ করা, পুলিশ-প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ এবং অবিলম্বে নগরায়ণ ও সড়ক নির্মাণের জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করা।

ফৌজদারি আদালতের সামনে কমরেড মাদার আলি নস্করের সভাপতিত্বে একটি সমাবেশও হয়। বক্তব্য রাখেন ফাল্গুনি হালদার, লক্ষ্মণ মণ্ডল, গুণসিন্ধু হালদার, অধীর নস্কর, মুজিদ গাজি প্রমুখ প্রতিনিধিবৃন্দ।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড মাদার আলি লস্কর

চীনের মডেল কীসের ও কার মডেল?

[চীনের 'উন্নয়ন' নিয়ে দুনিয়া জুড়ে এখন হৈ চৈ। আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্কের মতো দাগী সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা থেকে শুরু করে দুনিয়ার বহু তথাকথিত বামপন্থীরাও এখন চীনের মডেলের গুণকীর্তন করছেন। কেন এত হৈ চৈ, কেন এত 'চীন বন্দনা', তা বুঝে নেওয়ার আগে চীনের উন্নয়ন সম্পর্কে দু/এক কথা জেনে নেওয়া ভাল। বহু তথ্য এ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি নিবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। এই পত্রিকাগোষ্ঠী নিজেদের পুঁজিবাদের সমর্থক বলেই পরিচয় দেয়, নানা প্রসঙ্গে 'চিনের মডেল' থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য বামপন্থীদের উপদেশ দেয়। সিপিএম যখন চীনকে 'মডেল' হিসাবে ঘোষণা করে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি পুঁজির ভজনা করে তখন সিপিএমকে বাহবা দেয় এই পত্রিকাটি। ফলে চীন সংক্রান্ত এই পত্রিকার লেখা থেকে উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি সংবাদ প্রতিদিন-এর জনৈক সাংবাদিকের অভিজ্ঞতাও এখানে আমরা তুলে ধরছি।]

সিপিএম চীনের পথে হাঁটছে। কিন্তু চীন কোন্ পথে হাঁটছে? সংবাদ প্রতিদিন-এর সাংবাদিক কুণাল ঘোষ চিন সফর করে পত্রিকাটির ২-১১-০৫ সংখ্যায় লিখছেন ঃ ''মাও জমানার পর দুয়ার খুলে দিয়েছে চিন। ডেঙ জিয়াং পিং যেদিন শ্লোগান তুলেছেন 'বেড়াল কালো না সাদা দেখার দরকার নেই — ইঁদুর মারলেই হল', সেদিন থেকেই চিনে পুঁজিবাদী দমকা হাওয়ার প্রবেশাধিকার। ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকার, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, রুগ্ন শিল্প বন্ধের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট কমিউনিজমের মৌলিক নীতি থেকে সরে যাচ্ছে চিন।'' তিনি অবশ্য একেই বলেছেন উন্নয়নের পথ। কিন্তু কেমনতরো এই উন্নয়ন? তারই একটা ছবি আনন্দবাজার পত্রিকায় দুটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একটি লিখেছেন সুনন্দা সেন (২৭-১০-০৫), অপরটি অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ১-১১-০৫)।

চিনে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে তার কারণ কী? সুনন্দা সেন দেখিয়েছেন, ''চিনের এই বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসার পিছনে কয়েকটি কারণ আছে, যথা, কম মজুরি (মেক্সিকোর এক-তৃতীয়াংশ, আর আমেরিকার পনেরো ভাগের এক ভাগ মাত্র), সাক্ষরতার উঁচু হার (বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী পনেরো বছর বা তার বেশি বয়সের জনসংখ্যার ৮৪.৫ শতাংশ), শ্রম বাজারের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, ডলারের সঙ্গে বিনিময়ের স্থিতিশীল হার, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য কর ছাড়ের সুবিধা, উন্নত পরিকাঠামো ইত্যাদি।''

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিপুল সুবিধা দিয়ে ডেকে আনার ফলে চিনের নাগরিকদের অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছে? ভারতবর্ষের দু'বছর পরে স্বাধীনতা লাভ করে সমাজতান্ত্রিক পথে চিন যে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল সেই চিন মাও সে তুঙের পর পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। সুনন্দা সেন লিখেছেন, ''শিল্পক্ষেত্রে পুঁজির বন্যা বইয়ে জাতীয় উৎপাদনের রেকর্ড বৃদ্ধির হার অর্জনের সাফল্য দিয়েও কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসাম্যকে দমন করা কঠিন। চিনের মোট জনসংখ্যার দুই- তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় আশি কোটি লোকই থাকেন গ্রামাঞ্চলে, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩৬ কোটির জীবিকা প্রথাগত কৃষিকাজ। একটি বেসরকারি সূত্রের হিসেবে, এঁদের মধ্যে ২১ কোটি কৃষক আসলে উদ্বৃত্ত, তাঁদের সরিয়ে নিলেও কৃষিজ উৎপাদন কমবে না। গ্রাম আর শহরে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যও চোখে পড়ার মতো। গ্রামের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২২৫৪ রেমনিবি, শহরের মাথাপিছু আয় এর তিনগুণেরও বেশি। জমির উৎপাদনশীলতা তেমন বাড়ছে না, ফসলের দামও ভাল পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে কৃষকরা চাষ না করে জমি ফেলে রাখছেন। বড় বড় শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে এই ঘটনা বেশি ঘটছে। চিনের প্রায় আট কোটি মানুষ আক্ষরিক অর্থেই 'যাযাবর' বা 'ভাসমান মানবগোষ্ঠী'। শহরাঞ্চলে তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, এমনকী কোনও পরিচয়পত্রও নেই। মনে রাখতে হবে, চিনে এই পরিচয়পত্র নামক বস্তুটিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, এর সাহায্যে অভিবাসী শ্রমিকদের শিল্পের প্রয়োজনমত শহরে নিয়ে আসা হয়, আবার প্রয়োজন ফুরোলে সরিয়ে দেওয়া হয়। শহর বা গ্রাম, কোথাওই গরিব মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নেই বললেই চলে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কারের আগেকার সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য আজ আর নেই। সাংহাই-এর মতো শহর, যেখানে ঐশ্বর্যই ধ্যানজ্ঞান, সেখানেও গরিব মানুষকে সহজেই খুঁজে বের করা যায়। চিনের অন্যতম রফতানি অঞ্চল তিয়ানজিং-এ একটি বহুজাতিক সংস্থার ইলেকট্রনিকস কারখানায় ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়েসি মেয়েরা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করে আয় করে দু'ডলারেরও কম। চিনে অসাম্য বাড়ছে, সম্পদের সমবণ্টন দ্রুতগতিতে কমছে, দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠছে।

চিনের জন নিরাপত্তা বিভাগের মন্ত্রী ঝাও ইয়ংকাং সম্প্রতি বলেছেন, ২০০৪-এ দেশে বিক্ষোভ, ভাঙচুর, হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেছে ৭৪০০০, ২০০৩-এ সংখ্যাটি ছিল ৫৮০০০। এক দশক আগে এমন ঘটনা ঘটত বছরে হাজার দশেক। সব ঘটনা সমান মাপের নয়, কিন্তু অশান্তি যে বাড়ছে সেটা সরকারি হিসেবেই পরিষ্কার। এবং ২০০৪-এ ওই ঘটনাগুলিতে জড়িত ছিলেন সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ লক্ষ নাগরিক। জনবহুল চিনেও সংখ্যাটা তুচ্ছ করা কঠিন।

কী আছে এই বর্ধমান বিক্ষোভের পিছনে? সাংবাদিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ''এক কথায় — বৈষম্য। একটি সাম্প্রতিক সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, দ্রুত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ের বৈষম্য যেভাবে বেড়েছে তার ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সামাজিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। এক সরকারি গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার সু হাইনান-এর মতে, ধনী ও দরিদ্রের আয়-বৈষম্য যেখানে পৌঁছেছে, সেটাকে তাঁরা হলুদ সংকেত বলে গণ্য করেন, এভাবে চললে ২০১০-এর মধ্যে লাল সংকেত জ্বলে যাবে। চিনে আয়ের বৈষম্য এখন লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুত, বৈষম্যের মাপকাঠিতে প্রজাতন্ত্রী চিন (অধুনা পুঁজিবাদী চিন) তার প্রতিবেশী 'ধনতান্ত্রিক' তাইওয়ানকে ছাড়িয়ে গেছে।

চিনে গত দুই দশকের বিপুল আয়বৃদ্ধির সুফল অনেক জায়গাতেই, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে পৌঁছয়নি, এ কথা অনেক দিনই শুনে আসছি। কিন্তু এখন আর প্রশ্নটা কেবল আঞ্চলিক বৈষম্যের নয়, 'উন্নত' এলাকাতেও তার প্রকোপ বাড়ছে। বিক্ষোভের ঘটনাগুলি প্রথম দিকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলেই সীমিত ছিল, ক্রমশ তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে। জুলাই-আগস্ট থেকে নয়া চিনের উন্নয়নী মহাতীর্থ সাংহাই শহরেও সরকার বা পুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে জমায়েত দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে নগর উন্নয়নের তাগিদে মানুষকে তার বাসস্থান থেকে, রুজি- রোজগারের জায়গা থেকে উৎখাত করে দেওয়ার নীতিকে তাঁরা অন্যায় বলে ঘোষণা করছেন। শহরের সুদৃশ্য সদনে পুর প্রশাসনের অধিবেশন চলার সময় অদূরে এক সমাবেশে কিছু প্রবীণ মানুষ স্লোগান দিয়েছেন, বিদ্রোহই ন্যায়সম্মত। এ স্লোগান শোনা যেত ষাটের দশকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়। ওই প্রবীণরা তখন নবীন ছিলেন।

কারা বিক্ষুব্ধ? কৃষিজমিতে শিল্পাঞ্চল বা শহর তৈরি হওয়ার ফলে যে কৃষিজীবীরা উৎখাত হয়েছেন, উন্নয়নের চাহিদা মেটাতে বসতি ও বেসাতি ভেঙে দেওয়া হয়েছে যে সব নগরবাসীর, বাজারের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া কারখানায় কাজ করতেন যে শ্রমিকরা, নামমাত্র মজুরিতে এবং প্রতিদিন ছাঁটাইয়ের খাঁড়া মাথায় নিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় যে তরুণদের — নানা বর্গের দরিদ্ররা বাজারের উপাসক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, ক্ষুব্ধ, সরব, সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁদের চোখে, যে পার্টি ছাপ্পান্ন বছর আগে 'কৃষক ও শ্রমিকের রাষ্ট্র' গঠন করেছিল, সে এখন ব্যবসায়ীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।''

চিনের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে বর্জন করে যেভাবে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, সিপিএমও সেইপথ অনুসরণ করে ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠী সহ দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কোন্ শ্রেণীর উন্নয়ন তা স্পষ্ট করে না বলে সাধারণভাবে তারা 'উন্নয়ন' 'উন্নয়ন' বলে চিৎকার করছে। শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের দালালরা চিরকালই এইভাবে গোল গোল করে 'দেশের স্বার্থ', 'দেশের উন্নয়ন' প্রভৃতি কথা বলে জনগণের দেশের প্রতি মমত্ববোধকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করে এসেছে। লেনিন এদের জনগণের নিকৃষ্ট শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে গিয়েছেন। পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন যে বাস্তবে ধনীর আয়বৃদ্ধি এবং গরিবের আয়হ্রাস সাংবাদিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় চিনে তা দেখে লিখেছেন, ''এ বৈষম্য উন্নয়নের অভাবে নয়, এ হল উন্নয়নেরই পরিণাম। দেং জিয়াং পিংয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত নয়া-চিন উন্নয়নের যে পথে দৌড়ে দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে অভূতপূর্ব এবং অতুলনীয় আয়বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে, তার অঙ্গ হিসেবেই এসেছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, উৎখাত হয়েছেন, ছাঁটাই হয়েছেন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ, সামাজিক নিরাপত্তার পুরনো কাঠামো ভেঙে পড়ছে। সবই ঘটছে বাজারের নির্দেশে।''

প্রশ্ন হচ্ছে, এই চীনকেই মডেল হিসাবে সিপিএম উল্লেখ করছে কেন? এর পিছনে তাদের একটা চালাকি কাজ করছে। তারা জানে, সাধারণ মানুষ এবং তাদের দলের সাধারণ কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ এখনও চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবেই মনে

সাতের পাতায় দেখুন

সরকারি বৃত্তি পরীক্ষা নিছক প্রহসন

তিনের পাতার পর

কত বড় মহৎ কর্মকাণ্ড করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

আসলে তারা যে সত্যিই কোন মহৎ কাজ করতে চায় না — তার প্রমাণ এই পরীক্ষা। নাহলে ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের নিয়ে সরকার এরকম ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে পারত না। ছাত্রছাত্রীদের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্বকে নিয়ে এরা চরম ছেলেখেলা করছে।

পাশাপাশি বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সাফল্যের দিকটি হল — এই পরীক্ষার প্রতি আগ্রহ থেকে লেখাপড়ার পরিবেশ আবার ফিরে এসেছে। পরীক্ষায় ফল ভাল করার জন্য ছাত্র-অভিভাবকরা যেমন চেষ্টা করছেন, তেমনি শিক্ষকমশাইরাও যত্নশীল হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পরেও ক্লাস নিচ্ছেন। এলাকার শিক্ষিত ছাত্র-যুবকরাও বিনা পারিশ্রমিকে ফ্রি-কোচিং ক্লাস করে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে দিচ্ছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবার লেখাপড়ার কিছুটা উৎসাহ এসেছে। ধ্বসে যাওয়া শিক্ষার মান কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করে একে উন্নত করার চেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে।

এই বৃত্তি পরীক্ষা শিক্ষকদের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছে। সরকারি নীতির ফলে অবহেলিত শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষকরা আবার নতুন উদ্যমে শিক্ষকতার মহান কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছেন। তাঁরা স্কুলে নিয়মিত যাচ্ছেন, পড়াচ্ছেন, পড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। ছাত্রদের তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তাই তো এই শিক্ষকরা সমস্ত কাজ ফেলে বিনা পারিশ্রমিকে বৃত্তি পরীক্ষার খাতা দেখছেন। শুধু দেখছেন বললে ভুল হবে, সরকারি পরীক্ষার মতো ঘাড় ধরে খাতা দেখানো নয়, আন্তরিকভাবে তাঁরা দ্রুত ফল প্রকাশ করার প্রয়োজনে অন্য কাজ ফেলে, রাত জেগে হলেও খাতা দেখে দিচ্ছেন। এঁরাই পরীক্ষার হলে গার্ড দিচ্ছেন এবং সরকারি বহির্মূল্যায়নের মতো ফাঁকি দিয়ে নজরদারি করা বা মুখ দেখে নম্বর দেওয়া নয়, যথার্থ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। তাই তো এই পরীক্ষা সকলের মনে গভীর আস্থা সৃষ্টি করেছে।

এই পরীক্ষার সামান্য ফি দিয়ে যে এত বড় কর্মকাণ্ড সফল করা যায় না — তা সকলে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই কোন পারিশ্রমিকের কথা কেউ ভাবতে পারেন না। বরং তাঁরা মনে করেন এই মহৎ কাজে তাঁর কিছু দান করা কর্তব্য। সেই তাগিদে শুধু প্রাথমিক শিক্ষকরা বা অভিভাবকরা নন, মাধ্যমিক শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। তাঁরাও সাধ্যমতো সহায়তা করছেন। বিনা পারিশ্রমিকে পরীক্ষার বিভিন্ন কাজ যথা নজরদারি, খাতা দেখা, এমনকী প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজ সুচারুরূপে করে চলেছেন। সর্বস্তরের মানুষের মনে এই পরীক্ষা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতি বছর কৃতী ছাত্রছাত্রীদের কয়েক লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে এক বিশাল অনুষ্ঠানে কৃতীদের হাতে বৃত্তির অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এত বিপুল পরিমাণ টাকা আসে কোথা থেকে? কারা দেন সেই টাকা? কোন ব্যবসায়ী মহল, কোটিপতিরা কিংবা বিদেশি টাকা — নাকি অন্য কোন পথে? যা আজ ভাবা দুষ্কর, সেই পথেই এই বিপুল অর্থ প্রতি বছর সংগৃহীত হয়। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হাজার হাজার অভিভাবক ২, ৫, ১০ টাকা — যে যার সাধ্যমতো এই তহবিলে দান করেন। এছাড়া বৃত্তি তহবিলে ৬০০, ১২০০ টাকার স্মারকবৃত্তি দান করেন কয়েকশত মানুষ। প্রিয়জনের স্মৃতিতে তাঁদের এই মহৎ দান। এভাবেই তিল তিল করে গড়ে তোলা তহবিল থেকেই প্রতি বছর ৬০০ এবং ১২০০ টাকা হিসেবে রাজ্য ও জেলা বৃত্তি দেওয়া হয় প্রায় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে — যার অর্থমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের দানে এত বড় কর্মকাণ্ড ধারাবাহিকভাবে পরিচালনার নজির খুঁজে মেলা ভার।

এই বৃত্তি পরীক্ষা আজ দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। বহু মানুষ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার ফলে আজ এত বড় পরীক্ষাকে পরিচালনা করতে কোন অসুবিধা তো হচ্ছেই না, বরং ক্রমাগত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। তাই এই পরীক্ষা নিছক একটি পরীক্ষা নয়, শিক্ষাকে বাঁচানো, শিক্ষার মানোন্নয়নের সহায়ক হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছে। কচি শিশুদের প্রাণে এ নতুন আলোকবর্তিকা বহন করে এনেছে। সকলের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে এই পরীক্ষা আজ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

চাষীদের উপর বিদ্যুৎভবনে পুলিশি বর্বরতা — জনগণ কী বলছেন?

২৮ অক্টোবর। অ্যাবেকার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত নদীয়ার খোদ্দার শেখের গ্রাম চুয়াখালিতে একটি সভায় বক্তা খুব উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'গতকাল সল্টলেক বিদ্যুৎভবনে যারা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিল, তারা পরিকল্পিতভাবেই সরকারি অফিসে হামলা চালাতে গিয়েছিল। সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্যই পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠি চালিয়েছে। পুলিশ গুলি চালায়নি, অথচ গুলি চালিয়েছে বলে ওরা অপপ্রচার করছে। এদের পিছনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে।' বোঝাই যাচ্ছিল, উপস্থিত কৃষক ও সাধারণ মানুষকে অ্যাবেকার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলাই ছিল বক্তার মূল উদ্দেশ্য। হঠাৎই সভার পিছন দিকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। দেখা গেল একজন-দুজন করে শ্রোতা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা?

অ্যাবেকার কয়েকজন সদস্য গ্রামে এসেছেন পরের দিনের নদীয়া জেলা বন্‌ধের সংবাদ প্রচার করতে। তাঁদের দেখেই পরিচিত কয়েকজন এগিয়ে এলেন। 'কেমন আছে খোদ্দার সেখ? বাঁচবে তো?' এগিয়ে এলেন আরও কয়েকজন। তারপর আরও, আরও। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি জমায়েতের রূপ নিয়ে নিল স্থানটি। সকলেই জানতে চান, গতকাল কৃষকদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর খবর। জানতে চান, আহতদের খবর। অ্যাবেকা প্রতিনিধিদের আসার খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে যায় এলাকায়। কে যেন গিয়ে খবরটা দিয়েছিল একটু দূরে চলতে থাকা সভাতে, আর তার ফলেই শ্রোতাদের থেকে প্রথমে একজন-দুজন করে উঠে আসতে থাকে, শেষে এমন হয় যে ফাঁকা হয়ে যাওয়া সভা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন উদ্যোক্তারা। উল্লেখ্য, সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএমের কৃষ্ণনগর পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক সুনীল ঘোষ।

কৃষিক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত মাসুল কমানোর দাবিতে গত ২৭ অক্টোবর অ্যাবেকার ডাকে সল্টলেক বিদ্যুৎ ভবনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার কৃষকের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে এবং নির্বিচার গুলি ও গ্যাসে কয়েকশ কর্মী আহত হন, গুলিবিদ্ধ হন। বাস থেকে নামিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজের সাথে অমানুষিকভাবে মারতে মারতে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৮০ বছরের বৃদ্ধ চাষী উত্তর ২৪ পরগণার শচীন্দ্রনাথ ভৌমিককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় পুলিশ এবং আরও ৫১ জন আহত চাষীর সাথে তাঁকেও গ্রেপ্তার করে জেলে পোরে। নৃশংসতায় পুলিশ সেদিন সল্টলেকে আর এক গুরগাঁও সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, 'পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে। সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রশাসন যে ব্যবস্থা নেবে তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।' রাজ্যের জনগণ কি সেটাই মনে করেন? সিপিএমের বক্তব্য কি তাঁরা সমর্থন করেন?

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন তহবিলে অর্থসংগ্রহের একটি কর্মসূচি চলছে। ২৭ অক্টোবর পুলিশি নৃশংসতার পরের দিন কলকাতা সহ জেলাগুলিতে কর্মীরা স্টেশনে, ট্রেনে, বাড়িতে বাড়িতে অর্থসংগ্রহ করছিলেন। সর্বত্রই মানুষ তাঁদের কাছে এগিয়ে এসে নিজেদের অন্তরের ঘৃণা এবং ব্যথাকে ব্যক্ত করেছেন, আন্দোলনকে আরও তীব্র, আরও শক্তিশালী করার আবেদন করেছেন, আহত চাষীদের সংবাদ জানতে চেয়েছেন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে অর্থ সাহায্য করেছেন। হাওড়া স্টেশনে চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলাকে আবেদন করতেই বললেন, 'আমরা টিভিতে সব দেখেছি। সহ্য করতে পারছিলাম না, টিভি বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা তো রাস্তায় নেমে লড়াই করতে পারি না, তাই যতটুকু পারি সাহায্য করতে চাই।' বর্ধমান শহরে এক যুবককে আবেদন করতেই তিনি বলেন, 'টিভিতে পুলিশি মারের দৃশ্য দেখার পর রাতে ঘুমোতে পারিনি, সারা রাত ছটফট করেছি, মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।' রিষড়া স্টেশনে এক মহিলা অর্থসাহায্য দিতে এগিয়ে এলে তাঁর স্বামী নিষেধ করলে মহিলা বলেন, 'টিভিতে যে দৃশ্য দেখেছি, তারপর না দিয়ে পারা যায় না।' এগিয়ে এলেন এক পুলিশ কর্মী। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করছি।' কলেজ স্ট্রীটের এক বইয়ের দোকানদার বিশ্ববিদালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, 'টিভিতে পুলিশি বর্বরতা দেখার পর রাতে ঘুমোতে পারিনি।' প্রচণ্ড উদ্বেগে জানতে চাইলেন, 'এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার হলে আন্দোলন গড়ে উঠবে কী করে? এর বিরুদ্ধে তোমরা দাঁড়াবে কী করে?' বেহালা চৌরাস্তা মোড়ে এক ব্যক্তি বললেন, 'শুধু প্রচার নয়, প্রতিবাদে কলকাতা অচল করে দিলেন না কেন?'

পুলিশি অত্যাচার সম্পর্কে অনিল বিশ্বাসের বক্তব্যে শুধু সাধারণ মানুষ নন, তাঁর দলের কর্মী-সমর্থকরাও প্রবল ধিক্কার জানিয়েছেন। শিয়ালদহ স্টেশনে এক প্রৌঢ় অর্থ সাহায্য করে বললেন, 'কত ট্রাম-বাস জ্বালিয়ে তবে এরা ক্ষমতায় এসেছে, আর আজ পুলিশি অত্যাচারের সাফাই গাইতে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের অজুহাত তুলছে!' বললেন, 'অনিল বিশ্বাস কোনও সরকারি পদাধিকারী নন, তাঁর কী রাইট আছে একথা বলার যে, সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে!' নাকতলায় মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ব্যাঙ্ককর্মীদের ডি এ বাড়ানোর আন্দোলন কখনও ভায়োলেন্ট হয় না, পেটের দায়ে যে আন্দোলন হয়, সেগুলো ভায়োলেন্ট তো হবেই। ফলে এই সমস্ত প্রচার নিয়ে একদম ভাববেন না।' হাওড়া স্টেশনে এক যুবক বলেছেন, 'আমি এস এফ আই করি, কিন্তু পুলিশ সেদিন আন্দোলনকারীদের সাথে যে আচরণ করেছে তা মোটেই ঠিক করেনি। আপনাদের কর্মীদের চিকিৎসার জন্য আমি সাহায্য করতে চাই।' একইভাবে অপর একজন বলেন, 'আমি সরকারি দলের সমর্থক। আপনাদের আন্দোলন সম্পর্কে আমার মতপার্থক্য আছে, তবুও আমি মনে করি, সরকার এটা ঠিক করেনি। এই টাকাটা রাখুন আপনাদের আহত কর্মীদের জন্য।' সি ই এস সি-র ম্যান্ডেভিলা ক্যাশকাউন্টারের সামনে প্রচারের সময় অ্যাবেকা কর্মীদের কাছে এগিয়ে এসে এক ব্যক্তি বলেন, 'এতদিন সিপিএম-কেই ভোট দিয়ে এসেছি, আর তা সম্ভব নয়। আমাকে আপনাদের সদস্য করে নিন, আমি আন্দোলনে থাকতে চাই।' সল্টলেকে প্রত্যক্ষদর্শী এক চিত্র সাংবাদিকের ঘটনার দুদিন পর দলের এক কর্মীকে পুলিশি বর্বরতার বিবরণ দেওয়ার সময়ও চোখেমুখে ছিল আতঙ্কের ছায়া।

৩১ অক্টোবর দমদম সেন্ট্রাল জেলে গিয়েছিলেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্যামল সেন। বিদ্যুৎ আন্দোলনে আহত কর্মীদের আঘাত দেখে তিনি বলেন, 'পুলিশ কাউকেই এমন অমানুষিকভাবে মারতে পারে না'। তিনি তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বিদ্যুৎভবনে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে অংশ নিয়েছিলেন হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, কোচবিহার সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে আসা কৃষকরা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গাইঘাটার এক প্রৌঢ় চাষী অনিল বিশ্বাসের মুখে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগ শুনে বলেছেন, 'মিথ্যা কথা। আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও যাইনি, আর সরকারি অফিস ভাঙতেও যাইনি। শুধু সরকারের কাছে আমাদের আবেদনটুকু পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম, পাইনি; ডি এম আমাদের কথা শোনেননি; বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে দেখা করেননি। তাহলে আমরা যাব কোথায়?' তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, 'সারা জীবন বামপন্থী রাজনীতি করেছি, এখানে সিপিএমের সংগঠন গড়ে তুলেছি, চিরদিন পুলিশের লাঠির বিরুদ্ধে বলে এলাম, আর আজ শেষ বয়সে এসে সরকারের পুলিশের লাঠি খেলাম, আর রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সেই লাঠি-গুলির পক্ষেই সাফাই গাইলেন— এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে!'

সাধারণ মানুষের এই প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দেয়, রাজ্যের ব্যাপক অংশের জনগণ এই আন্দোলনের সাথেই আছেন। ক্ষমতার দম্ভে অনিল বিশ্বাসরা যা-ই বলে থাকুন, রাজ্যের সাধারণ মানুষ তা সমর্থন করেন না। ঘটনার পরে পরেই মানুষ পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে, চায়ের দোকানে — সর্বত্র সরকারকে ধিক্কার জানিয়েছেন। রাজ্যজুড়ে এই আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে প্রবল আবেগ, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভয়াবহ পুলিশি বর্বরতার পরও অ্যাবেকা কর্মীরা যেখানেই যাচ্ছেন, কৃষকরা গভীর আবেগে তাঁদের বুকে টেনে নিচ্ছেন। বিপরীতে অনিলবাবুদের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জনসাধারণ থেকে তাঁরা আজ অনেক দূরে— কার্যত বিচ্ছিন্ন। জনগণের সমর্থন নয়, লাঠি-গুলি, পুলিশ-মাফিয়াই আজ তাঁদের ক্ষমতায় থাকার একমাত্র হাতিয়ার।

আমেরিকায় ক্ষুধার্ত মানুষ বাড়ছে

চারের পাতার পর

মানুষের কাছে স্বপ্নের শহর হিসাবে তুলে ধরা হয় যে নিউইয়র্ককে, সেখানেও দেখা গেছে ঋণগ্রস্ত নিঃস্ব দেউলিয়া মানুষের মিছিল। নিউইয়র্ক রাজ্যটির বিভিন্ন শহরে অসহায় মানুষকে দেউলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ চালাতে আদালতগুলিকে এমনকী শনি-রবিবার পর্যন্ত খোলা রাখতে হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এমনকী পরিবারের শিশুদের পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে কোর্টচত্বরে দু-তিন দিন ধরে বসে থেকেছেন দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার আবেদন নিয়ে।

কলোরাডোর ডেনভার শহরে প্রবল শীত ও তুষারপাতের মধ্যে ভোর হওয়ার আগে থেকে মানুষ আদালতের দরজায় ভিড় করেছে। জর্জিয়ার আটলান্টায় দেউলিয়া মানুষের চাপে অন্যরা আদালতে ঢুকতে পর্যন্ত পারেনি। টেক্সাসের ডালাসে এমনকী ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে পর্যন্ত পাওনাদারের গ্রাস থেকে নিজের বসতবাড়িটুকু বাঁচাতে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

জর্জ বুশ ও তাঁর সহযোগীরা দেউলিয়া ঘোষণা সংক্রান্ত জনস্বার্থবিরোধী যে নতুন আইনটি চালু করেছেন, তার বিরুদ্ধে গোটা আমেরিকায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সমস্ত নাগরিককে না হোক, অন্তত সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ঝড় কাটরিনায় আক্রান্ত মানুষজনকে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছে নানা মহল থেকে। কিন্তু সে দেশের দেউলিয়া ঘোষণা করার আদালতগুলির ওপর নজরদারি করে যে মার্কিন ট্রাস্টি প্রোগ্রাম, তারা সেই দাবিতে কর্ণপাত তো করেইনি, উপরন্তু ঝড়ে বিপর্যস্ত মানুষ যাতে নিজেদের দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে না পারে, তারই ভালরকম বন্দোবস্ত করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ দি টেলিগ্রাফ, ১৮-১০-০৫)

কেন মার্কিন সরকার এমন একটি সিদ্ধান্ত নিল, তা প্রকাশিত সংবাদে স্পষ্ট করা হয়নি ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির ও ঋণদাতা কোম্পানিগুলির পরামর্শ মতোই বুশ সরকার পুরানো আইন বাতিল করেছে। কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে, ভোগবাদের উপর ভিত্তি করে যখন মার্কিন অর্থনীতির ইঞ্জিন চলে, তখন মানুষের ভোগে টান পড়লে ইঞ্জিনও গতি হারাবে। আসলে মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতি এক গভীর সঙ্কটে পড়েছে। এমনিতেই সরকারের বাজেটে ঘাটতি বাড়ছিল, এখন যুক্ত হয়েছে ইরাক যুদ্ধের বিশাল খরচ। মার্কিন সরকার এখন বাজারে বণ্ড ছেড়ে ঘরে ডলার তুলতে চাইছে। সরকারের নিজস্ব ঋণের চাহিদা গিয়েছে বেড়ে। ব্যাঙ্ক ও ঋণদাতা কোম্পানিগুলি নিশ্চয় বলেছে, বকেয়া ঋণ আদায় না হলে তারা সরকারকে ঋণ দেবে কী করে? কিন্তু বুশের সাধ্য নেই, একচেটে পুঁজিপতিদের উপর কর চাপানোর, ক্ষমতা নেই পুঁজিপতিদের বকেয়া ঋণ শোধ দিতে বলার। অতএব, কোপ সেই সাধারণ মানুষের উপরেই। এর দ্বারা বাজারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদায় টান পড়ে উৎপাদনে আঘাত আসবে — একথা জেনেও মার্কিন সরকারকে ঐ পথেই যেতে হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির আজকের সঙ্কটের চরিত্র এমনই। একটা সঙ্কট থেকে বাঁচতে যে পথ নিচ্ছে, তা আরও বড় সঙ্কটে ফেলে দিচ্ছে পুঁজিবাদকে।

আমেরিকার জনগণ কীভাবে নিচ্ছে সরকারের এই পদক্ষেপগুলিকে ? বহুকাল যে দৃশ্য দেখা যায়নি, এখন শহরে শহরে দেখা যাচ্ছে শ্রমিক কর্মচারী ছাত্র-শিক্ষক-মহিলা সহ সকল অংশের মানুষের বিশাল বিক্ষোভ। ৩ নভেম্বর ছিল জর্জ বুশের পুনর্নির্বাচনের বর্ষপূর্তি। এদিন গোটা আমেরিকা জুড়ে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে নেমে আওয়াজ তুলেছে — "জর্জ বুশকে এখনই তাড়াও", "বুশ মিথ্যা বলছে, জনগণ মরছে।" আর্জেন্টিনায় গেছেন বুশ, প্রবল বিক্ষোভ সেখানেও। (তথ্যসূত্র ঃ প্রতিদিন, ২/১১, দি টেলিগ্রাফ ঃ ১৮/১০।

কীসের ও কার মডেল?

ছয়ের পাতার পর

করে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থেকে চীন সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা আবেগ আছে। অথচ, চীনের মধ্যে যে এতবড় পরিবর্তন ঘটে গেছে, সে যে আর সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই, সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে এসে সে যে বর্তমানে পুঁজিবাদী রাস্তায় হাঁটছে — এতসব খবর সকলে রাখেনা। ফলে তাদের এই অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে চীনকে মডেল হিসাবে দেখিয়ে সিপিএম তাদের সমস্ত অপকর্মকে গ্রহণ করিয়ে নিতে চাইছে। এর দ্বারা মার্কসবাদকে ক্রমাগত কলঙ্কিত করে জনগণের পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র এই শক্তিশালী হাতিয়ারটিকে দুর্বল করাই নয়, পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে চিহ্নিত পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলি থেকেও সিপিএম অনেক বেশি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। এ বিষয়ে তাদের দলের সমস্ত সৎ কর্মী এবং সাধারণ মানুষ যাঁদের এখনও খানিকটা মোহ আছে, যত দ্রুত সচেতন হবেন ততই দেশের ও জনগণের পক্ষে মঙ্গল।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

পানীয় জলের দাবিতে মহিলাদের মিছিল গোসাবায়

রাঙাবেলিয়া পাখিরালয় থেকে গোসাবা বাজার প্রায় ৮ কিমি পথ। মহিলারা মিছিল করলেন কলসি কাঁখে নিয়ে। তাঁদের দাবি পানীয় জল। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও এই সমস্ত অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। গোসাবা কলকাতা মহানগরী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এখানকার এম এল এ বিরোধী দলেরও নয়। একটানা ২৯ বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টই এখানে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তবুও কেন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি? কেন এখানকার মানুষকে পুকুরের জল পান করতে হবে? কেন অপেয় জল পান করে ডায়েরিয়া আমাশয় প্রভৃতি রোগের শিকার হতে হবে? গোসাবা বিডিও'র কাছে ২৮ অক্টোবর লাহিড়ীপুর মহিলা সমিতি ও প্রভাতী নারী মঙ্গল সমিতির নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক মহিলা এই প্রশ্ন করতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু বিডিও দোতলা থেকে নেমে এলেন না, সমবেত মহিলাদের সামনে। বিডিও'র এই আচরণ প্রতিবাদী মহিলাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বেড়ে যায় স্লোগানের প্রাবল্য। চলে বক্তৃতা। তারপর মহিলারা এগিয়ে গেলেন বিডিও'র ঘরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে এসে বন্ধ করে দিল লোহার গেট। এভাবেই পুলিশ-প্রশাসন জনগণের দাবি উপেক্ষা করতে পারদর্শী। কিন্তু মহিলারা তখন দাবি আদায়ে মরিয়া। অবশেষে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাইকে ঘোষণা করে তাঁদের দাবি মেনে নিলেন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে তিনটি টিউবওয়েল বসানোর ও ফাল্গুন মাসে লোহার পাইপ লাইন বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করেন।

এ'দিনের বিডিও অফিস অভিযানে লাহিড়ীপুর অঞ্চলের সাধুপুর, জেম এস পুর, বাণীখালি, রজতজুবিলী ও সাতজেলিয়া অঞ্চলের দয়াপুকুর গ্রামের প্রায় হাজার খানেক মহিলা সামিল হয়েছিলেন। ব্যানারে, প্ল্যাকার্ডে শোভিত কলসি কাঁখে মহিলাদের এই মিছিল দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে সামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। সকলেরই অবাক দৃষ্টি। কিন্তু কেন এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধান, এমএলএ, এমপি প্রভৃতি জনপ্রতিনিধি থাকতে এই অঞ্চলের মহিলারা প্রভাতী নারীমঙ্গল সমিতির মত সংগঠন গড়ে তুলেছেন? কারণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা সবাই অতি ব্যস্ত। জনগণের প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে তাঁদের ভাবার সময় কই? তাই নিজেদের সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন মহিলারা। গড়ে তুলেছেন লড়াইয়ের হাতিয়ার গণকমিটি। তাঁদের দাবি, বিপিএল তালিকায় সমস্ত গরিবদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সবাইকে রেশন কার্ড দিতে হবে, বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। বিডিও অফিসের সামনে সভা পরিচালনা করেন করুণা মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন লাহিড়ীপুর মহিলা সমিতির উপদেষ্টা বিনয় রায়। অন্যতম উপদেষ্টা নির্মল সরকার এই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকার প্রশংসা করে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বাসের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে পরিবহন যাত্রী কমিটির ডেপুটেশন

তেলের দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে দফায় দফায় পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি, রাজ্যের অন্যান্য অংশের জনগণের মতো কোচবিহার জেলার জনগণের জীবনেও মারাত্মক বোঝা হিসাবে নেমে এসেছে। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই ক্ষোভকে সংগঠিত আন্দোলনের রূপ দিতে গড়ে উঠেছে পরিবহন যাত্রী কমিটি'র কোচবিহার জেলা শাখা। কমিটির নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভা, বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধ সংগঠিত হচ্ছে। সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করে গত ২৬ অক্টোবর জেলাশাসকের কাছে একটি দাবিপত্র দেওয়া হয়। তাতে দাবি করা হয়ঃ

(ক) বাসের ভাড়া বাড়ানো চলবে না; (খ) তেলের উপর চাপানো অত্যধিক মাত্রায় সেস, ট্যাক্স ও রোড ট্যাক্স ইত্যাদি কমাতে হবে; (গ) একজনের বসার মতো সিটে দু'জনকে বসানো চলবে না; (ঘ) পরপর দুটো সিটের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকা চাই, যাতে পাশের যাত্রী সহজেই বেরুতে পারেন; (ঙ) সিটগুলো নরম, সমান ও প্রশস্ত হতে হবে যাতে ভদ্রভাবে সোজা হয়ে বসা যায়; (চ) ভাঙাচোরা গাড়ি চলবে না; (ছ) বাসের পাদানির উচ্চতা এমন হবে যাতে বয়স্ক যাত্রী, মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধীগণ সহজেই বাসে ওঠানামা করতে পারেন; (জ) বাসগুলি স্টপেজগুলিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বা রেষারেষির জন্য তীব্রগতিতে চালানো বন্ধ করতে হবে। গতির সমতা বজায় রাখতে হবে; (ঝ) রাস্তা ভাঙা বা অপ্রশস্ত থাকা চলবে না; (ঞ) বাসে অরুচিকর গান, টিভি চালানো, উচ্চ আওয়াজে গান বাজানো বন্ধ করতে হবে; (ট) যাত্রীদের প্রতি একশ্রেণীর বাসচালক ও কনডাক্টরের দুর্ব্যবহার ও কদর্য উক্তি বন্ধ করতে হবে; (ঠ) ছাত্রসহ নিয়মিত যাত্রীদের বাসভাড়ায় কনসেশন দিতে হবে।

দাবিপত্রের প্রতিলিপি এন বি এস টি সি'র চেয়ারম্যান এবং আর টি ও'র কাছেও পাঠান হয়। জেলাশাসকের কাছে পাঠানো প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির সভাপতি শোভা বল, সম্পাদক পরিতোষ সরকার, পার্থজিৎ ইসোর, সুহাসিনী রায় ও বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী।

২০ অক্টোবর কোচবিহারের সাতমাইল বাজারে পথ অবরোধ

প্রচারকাজেও বাধা, পুলিশি অত্যাচার, হয়রানি

গত ২৯ অক্টোবর কলকাতায় বাগুইহাটি এলাকায় আন্দোলনের প্রচার ও জনগণের কাছ থেকে দলের আন্দোলন তহবিলে অর্থসংগ্রহ করছিলেন এস ইউ সি আই কর্মীরা। আগের দিনও অর্থসংগ্রহ অভিযান হয়েছে। অঞ্চলে এস ইউ সি আই-এর এ ধরনের কর্মসূচি নতুন নয়। তবে ঐদিন প্রচারে, ২৭ অক্টোবর বিদ্যুৎ ভবনের সামনে চাষীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছিল। সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎ অফিসারসহ কয়েকজন পুলিশ কর্মী এসে এস ইউ সি আই কর্মীদের বলেন, আজ ভি আই পি রোড দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যাবেন, মুখ্যমন্ত্রী যাবেন, এখানে প্রচার করা চলবে না, আপনাদের অনুমতি নেওয়া নেই, অতএব সকলকে আউটপোস্টে যেতে হবে, না গেলে জোর করে নিয়ে যাব। কর্মীরা কিছু বলতে যাওয়ামাত্রই, পুলিশ পার্টি সংগঠক কমরেড অরুণ সেনকে হাত ধরে টানতে শুরু করে, মহিলা কর্মীরা সহ অন্যরা আপত্তি জানালে, স্বয়ং পুলিশ অফিসার সকলকে চড়, ঘুষি, লাঠি মারতে মারতে বলেন, "বিপ্লবীয়ানা ঘুচিয়ে দেব।" এরপর টেনে হিঁচড়ে কর্মীদের পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেও কমরেড স্বপন সাহাকে নির্মমভাবে পুলিশ মারে। এছাড়াও কমরেডস্ রাজকুমার বসাক, মল্লারিকা কুণ্ডু, রুমা পণ্ডা ও শ্যামলী করকেও পুলিশ রাজারহাট থানার অর্জুনপুর আই সি-তে ধরে রাখে এবং রাত ১১টার পর এদের মুক্তি দেওয়া হয়।

ভি আই পিদের নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের এভাবে মারধোর ও গ্রেপ্তার কি প্রমাণ করে না যে, এ রাজ্যে পুলিশি রাজ কায়েম হয়েছে?

বরাক উপত্যকায় এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন

আসাম রাজ্যের শিলচর লামডিং ব্রডগেজ রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সম্পন্ন করা, বরাক উপত্যকার বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার দাবিতে গত ২৮ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই হাইলাকান্দি জেলা কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। স্টেশন রোড থেকে মিছিলটি বের হয়ে জেলাধিপতির কার্যালয়ে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির এক প্রতিনিধি দল জেলাধিপতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠান।

একই সঙ্গে দু'টি স্মারকলিপি রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে চার দফার দাবি সনদ পেশ করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজ সহ সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের শূন্য পদগুলিতে ডাক্তার-নার্স ও কর্মী নিয়োগ করে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার দাবি জানানো হয়। বরাক উপত্যকার সমস্যা নিয়ে দলের হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এবং শিলচর জেলা কমিটি যৌথভাবে আন্দোলনে নেমেছে। ৪ অক্টোবর করিমগঞ্জে এবং ১৮ অক্টোবর শিলচরে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে।

তিন জেলার সমন্বয় রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড শ্যামদেও কুর্মী বলেন, রেললাইন সম্প্রসারণে ঢিলেমির পেছনে রয়েছে অসাধু বাস-ট্রাক মালিকচক্রের ভূমিকা। কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন জনগণের ধারাবাহিক আন্দোলন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন রজত সেনগুপ্ত, সুশীল পাল, তৈয়বুর রহমান লস্কর, আফজল হুসেন মজুমদার এবং প্রভাস সরকার। মিছিলে পাঁচ শতাধিক মানুষ যোগ দেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে

জনসভা

২৫ নভেম্বর, বিকাল ৫টা
মহাজাতি সদন, কলকাতা

বিষয়ঃ *মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা*

বক্তাঃ এস ইউ সি আই এবং বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির নেতৃবৃন্দ

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

সফল করুন
২৪ নভেম্বর, মহাজাতি সদন, কলকাতা

দেশের ও বিদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in